
অভীক সরকার
খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ

খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ

অভীক সরকার

খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ



পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী

প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৯ **তৃতীয় মুদ্রণ** অক্টোবর ২০১৯
চতুর্থ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৯ **পঞ্চম মুদ্রণ** ফেব্রুয়ারি ২০২০
ষষ্ঠ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০২০ **সপ্তম মুদ্রণ** মার্চ ২০২০

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

KHNORA BHOIROBIR MATH
Two Horror Fictions
by Avik Sarkar
Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 91-33-22411175, 9433075550, 9830806799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-8374-584-0

একমাত্র কন্যা আরাত্রিকাকে

কৈফিয়ত

কালিয়া মাসানের ব্যাপারে আমাকে প্রথম জানিয়েছিলেন এক বন্ধু। অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে আড্ডা মারতে মারতে তিনি বলেছিলেন, মৃতদেহের ছাই মন্ত্রপূত করে তৈরি করা হয় ভয়ঙ্কর বিষ। এই নিয়ে কিছু একটা লেখার ইচ্ছে ছিলই। ফলে মায়াকানন পূজাবার্ষিকী-র সম্পাদক অর্ক পৈতণ্ডী যখন আমাকে একটি উপন্যাস লেখার অনুরোধ করেন, তখন আমি ভাবলাম কালিয়া মাসানই হোক সেই উপন্যাসের বিষয়। আরও ভেবেছিলাম যে একটি গল্প বলিয়ে চরিত্র তৈরি করব, যাঁর জবানীতে ঘটনাটা বলা হবে। তখনই দীপুপিসির কথা মাথায় আসে।

সব মিলিয়ে জন্ম নেয় কালিয়া মাসান। ২০১৮ সালের মায়াকানন পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হয় এই উপন্যাস এবং বেশ কিছু পাঠক তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসটি পড়ে আমাকে বেশ কিছু মূল্যবান উপদেশ দেন এবং বই আকারে বের করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই উপন্যাসটিই পরিমার্জিত হয়ে এই বইতে জায়গা পেয়েছে।

'খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ' উপন্যাস নয়, উপন্যাসিকা বলা যেতে পারে। কর্মসূত্রে আমাকে পূর্বভারতের বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়াতে হয়। সেভাবেই বিহারের এক প্রত্যন্ত গ্রামে একটি পরিত্যক্ত মন্দির দেখে আমার কৌতূহল জেগেছিল। তার পিছনের জনশ্রুতি শুনে গড়ে তুলেছিলাম 'খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ'-এর কাহিনি। দেব সাহিত্য কুটিরের কর্ণধার শ্রদ্ধেয়া রূপা মজুমদার নবকল্লোলের ২০১৮-র পৌষালী সংখ্যায় এটিকে স্থান দেন। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

কৃতজ্ঞতা জানাই বন্ধু ও সুহৃদ মৌপিয়ালি দে সরকার এবং অনুষ্টুপ শেঠকে। এই দুজনে আমার প্রায় সব লেখার প্রথম পাঠিকা, এবং সবচেয়ে বড় সমালোচকও বটে। কৃতজ্ঞতা রইল বন্ধুবর অর্ক পৈতণ্ডীর প্রতি, এক অখ্যাত কলমচির লেখা পূজাবার্ষিকীতে স্থান দেওয়ার জন্য। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পাঠক ও পাঠিকাদের। তাঁরাই আমার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।

অভীক সরকার

রথযাত্রা ১৪২৬
কলকাতা

সূচিপত্র



কালিয়া মাসান

খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ



কালিয়া মাসান

খাতাটা ইনভিজিলেটরের হাতে তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য উল্লাস অনুভব করলাম।

আজ শেষ পেপার ছিল জিওগ্রাফির। খাতা জমা দিয়ে বাইরে এসে দেখি স্কুলের গেটের পাশের বুড়ো বটগাছটার নীচে সায়নী, অদ্রিজা, সায়ন্তন, কৌশিক, অতনু, আড্ডা দিচ্ছে। আমাকে দেখেই হইহই করে উঠল সবাই।

আমিও চট করে সেই আড্ডায় শামিল হতে যাচ্ছি, এমন সময় ব্যাগের মধ্যে খড়ড়ড় করে মোবাইলটা আওয়াজ করে উঠলো। ফোনটা বার করে দেখি পলি, মানে আমার বোনের ফোন। কলটা অ্যাক্সেপ্ট করে ফোনটা কানে ঠেকাতেই যেন একটা গ্রেনেড ফেটে পড়ল কানের কাছে, 'দাদা, এক্ষুনি বাড়ি চলে আয়, দীপুপিসি এসেছে।'

ব্যস, আর কিছু বলার দরকার ছিল না। আড্ডা গেল চুলোয়, আমি প্রায় উড়ে গিয়ে রহমান কাকুর রিকশায় ল্যান্ড করলাম। দীপুপিসি এবার প্রায় বছর দুয়েক পর আমাদের বাড়িতে এলেন। মানে গল্পের পুরো খনি নিয়ে এসেছেন পিসি! সমস্ত মন খারাপ মুহূর্তে উধাও!

এখানে দীপুপিসির পুরো পরিচয়টা দিয়ে রাখি। পিসির পুরো নাম দীপান্বিতা সরখেল। উনি কিন্তু আমার নিজের পিসি নন, বাবার কলেজের জুনিয়র। মানে বাবা যখন ফাইনাল ইয়ারে পড়তেন, দীপুপিসি সেই বছরই কলেজে ভর্তি হন। সেই সূত্রে আমরা সবাই দীপুপিসি বলে ডাকি। বাবা অবশ্য ইকোনমিক্সের লোক, দীপুপিসি জিওলজির। তবে অন্য স্ট্রিমের হলে কী হবে, দীপুপিসিও অধীরদা বলতে অজ্ঞান, আর বাবাও দীপুপিসিকে খুবই স্নেহ করেন। আর আমার মা তো বলতে গেলে দীপুপিসির বুজম ফ্রেন্ড!

অতএব এ-বাড়িতে মিস দীপান্বিতা সরখেলের প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে কারও মনে কোনও সংশয় থাকার কথা নয়। পিসির বয়েস একচল্লিশ, হাইট পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি, আমার মতোই রোগা টিংটিঙে চেহারা, আর বয়েজকাট চুল। তবে দীপুপিসিকে দেখলেই যেটা সবার আগে নজরে পড়ে সেটা হল পিসির চোখদুটো। সবসময়ে কৌতুকে, ঔজ্জ্বল্যে, হাসিতে যেন হীরের টুকরোর মতো ঝকমক করছে। দীপুপিসি অবশ্য বছর বিশেক ধরে দেশের বাইরেই থাকেন। চাকরি সূত্রে একটা অয়েল এক্সপ্লোরেশন কম্পানির চিফ সায়েন্টিস্ট। পিসির বাংলায় কিন্তু এতদিন ধরে দেশের বাইরে থাকার কোনও ছাপই নেই। কথাবার্তা শুনলে মনে হয় উত্তর কলকাতার লোক, এক্ষুনি কলঘর থেকে নেয়ে এসে পান্তাভাত খেতে খেতে পাড়ার পুপুদি'র সঙ্গে গপ্প করছে!

পিসির আদত বাড়ি অবশ্য ভবানীপুরে। বছরের দশমাস পৃথিবীর নানা যায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে, এই এপ্রিল মে নাগাদ দুটো মাস কলকাতায় নিজের প্রাচীন পৈতৃক বাড়িতে থাকতে আসেন। এখানে এটা বলে রাখা ভালো যে দীপুপিসি বিয়ে শাদি করেননি, ফলে ছেলেমেয়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

আগেই বলেছি, পিসি জিওলজিস্ট। কাজের সূত্রে অনেক বিচিত্র জায়গায় যেতে হয়েছে। অভিজ্ঞতাও হয়েছে প্রচুর। তারই দু-একটা পিসি মাঝেমধ্যে কালোজিরে-রসুন-পেঁয়াজ-আদাবাটা ইত্যাদি মাখিয়ে আমাদের শোনান। বাবা অবশ্য বলেন দীপুপিসি যা বলেন তার বেশিরভাগই গুল, পিসির উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। কিন্তু পিসির গল্প বলার কায়দা এমনই চমৎকার, আর গল্পগুলোও এমনই রোমহর্ষক যে একবার শুনলেই পরের গল্পটা শোনার লোভে মনটা আঁকুপাঁকু করে।

বাড়ি এসে দেখলাম যা ভেবেছিলাম তার প্রায় দেড়া কেস। দীপুপিসি এসেছে শুনে পাশের ব্লক থেকে মিমি, সন্দীপন, অরিজিৎ, এরা সবাই এসে হাজির। আমাদের দোতলা বাড়ির ওপরের ফ্লোরটা একদম গমগম করছে মানুষজনে। মা তো হেবি খুশি, কাউকে খাওয়াতে পারলে মা আর কিচ্ছুটি চায় না। লুচিভাজার গন্ধ পাচ্ছি, পাশের ঘর থেকে বাবা টেলিফোনে চাপা গলায় কাউকে চিকেন কষার অর্ডার দিচ্ছে শুনলাম। লোকজন, হই হুল্লোড়, আড্ডা এসব আমার চিরকালই ফেভারিট। তার ওপর দীপুপিসি এসেছে মানে গল্পে আড্ডায় আজকের দিনটা পুরো জমজমাট।

আমিও তো সেই গল্প শুনবার লোভেই এক এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি টপকে দোতলায় এলুম। আর আসা মাত্রই আমাকে দেখে সবাই হইহই করে উঠল। দীপুপিসি চেঁচালেন সবচেয়ে বেশি। বাবাকে ডেকে বললেন, 'ও অধীরদা, ছেলে তো ম্যান হয়ে গেল গো! ক্লাস এইট হয়ে গেলো, তার ওপর কচি করে গোঁফ অবধি গজিয়ে গেছে দেখছি। এবার আমার হাতে ছেড়ে দাও দেখি, আমার সঙ্গে একটু ঘুরে দুনিয়াটা দেখুক। কী বলিস রে লম্বকর্ণ?' আমি একটু লাজুক হেসে আর জবাব দেওয়ার জন্য দাঁড়াইনি। ব্যাগ রেখে দৌড়ে গিয়ে স্নান করার জন্যে টয়লেটে ঢুকে পড়েছি।

স্নানটান সেরে, সবাই মিলে লুচি আর কষা মাংস দিয়ে লাঞ্চ সেরে যখন ড্রয়িংরুমে এলাম, তখন অত বড় ঘরটা পুরো লোকজনে গমগম করছে। লোক বলতে অবশ্য আমরা জনা পাঁচেক কুচোচিংড়ি আর বাবা। মা বলল যে এখুনি মোক্ষদা মাসিকে দিয়ে টেবিল পরিষ্কার করেই আসছে।

এদিকে আকাশ এসেছে কালো করে, জোরে হাওয়া দিতে শুরু করেছে। কালবৈশাখীর পূর্বাভাস আর কী! মা এসে বসতে না বসতেই চারপাশ অন্ধকার হয়ে এল। বড় বড় ফোঁটায় শুরু হল বৃষ্টি আর শোঁ-শোঁ শব্দে প্রবল ঝড়ে উথালপাতাল হয়ে উঠল চারিদিক। সে কী ঝড়ের গর্জন, বাবা রে! মা এসে ঝটপট দরজা জানলা বন্ধ করে বলল, 'ও দীপুদি, একটা ভূতের গল্প বলো না, এই ওয়েদারে ভূতের গল্প দারুণ জমবে কিন্তু।'

কথাটা শুনে ভুরুটুরু কুঁচকে নাক উঁচু করে কী যেন ভাবলেন দীপুপিসি। তারপর গম্ভীরস্বরে বললেন, 'দ্যাখ মণি, তুই তো জানিস, আমি ঘোর যুক্তিবাদী মানুষ। ভূতপ্রেত দত্যিদানো ডাইনি পিশাচ তাবিজ কবজ এসবে কোনওদিনই বিশ্বাস করিনি, আজও করি না। কিন্তু আজ থেকে বছর বিশ-বাইশ আগে সেবার পুরুলিয়াতে একটা ফিল্ডওয়ার্কে গিয়ে যা ভয়ানক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটাকে আর অন্য কিছু বলে উড়িয়ে দিতে পারিনি। গল্পটার পুরোটা আমিও প্রথমে বুঝিনি। পরে অবশ্য পিটার, মানে পিটার হেমব্রমের পারিবারিক কাহিনি শুনে সবটা জোড়াতালি দিয়ে পুরো কাঠামোটা দাঁড় করাবার চেষ্টা করি। গল্পটা বলি শোন।'

আমরা সবাই গা ঘেঁষে বসলাম, দীপুপিসির ফেমাস গল্প শুরু হতে চলেছে। দিল থামকে বৈঠিয়ে ভাইলোগ...

'সেদিনও ছিল এমনই একটা ঝড়বৃষ্টির দিন, বুঝলি।'

কোলবালিশটাকে কোলে জাপটে ধরে তার ওপর ভর দিয়ে বলতে শুরু করলেন দীপুপিসি, 'আমি তখনও কলেজে, ফাইনাল ইয়ার চলছে। তোরা তো জানিসই, আমার বাবার বদলির চাকরি ছিল। তখন বাবার পোস্টিং হাবড়াতে। হাবড়া বলতে আবার হাওড়া বুঝিসনি বাপু। বারাসাত পেরিয়ে তবে হাবড়া-অশোকনগর। এখন তো জায়গাটা পুরোদস্তুর শহর হয়ে উঠেছে, আমাদের ছোটবেলায় হাবড়া-অশোকনগর গাঁ গেরাম ছিল বললেই চলে। তারই মধ্যে আমাদের কলোনিটাই ছিল যা একটু ভদ্রস্থগোছের। দূরে দূরে ছড়ানো একতলা বাড়ি, প্রায় সব বাড়ির সামনে ফুলের কেয়ারি করা বাগান। আর বাড়ির পেছনে অনেকটা জায়গা জুড়ে বেড়া দিয়ে বাঁধা। তখন সবে টিভি এসেছে আমাদের ওদিকে। তাতে একটা মাত্র চ্যানেল, তাও বহু কষ্টে সন্ধেবেলায় কয়েক ঘণ্টার জন্যে দেখার পারমিশন পেতুম। এই তোদের মতো নাকি, এখন তো দেখি কোটিখানেক চ্যানেল, যখনই টিভি খুলি, দেখি ভূতের নেত্য চলছে, হুঁঃ।

সে যাই হোক। পার্ট ওয়ান সবে শেষ হয়েছে, পুজো শেষ হলেও সেবার বর্ষা চলেছিল আরও মাসখানেক। মাস দেড়েক বাদে আমাদের একটা ফিল্ড ওয়ার্ক আছে পুরুলিয়াতে, তারই প্রিপারেশন নিচ্ছি তখন। সে বছর তখনও ভালো করে শীত পড়েনি, তবে পড়বে পড়বে করছিলো, বুঝলি। তবে পুরুলিয়া ফিল্ড ওয়ার্কের ডেট নভেম্বরের সেকেন্ড উইক নাগাদ। আবহাওয়া আপিস বলছিল যে ততদিনে জাঁকিয়ে শীত পড়ে যাবে। সেই আশাতেই ছিলুম।

দিনটা ছিল খুব সম্ভবত শনিবার, তার ওপর অমাবস্যা। আমি আর আমার বান্ধবী মহুয়া গেছিলাম কলেজ স্ট্রিট, কিছু বই কিনতে। অধীরদা, তোমার মহুয়াকে মনে আছে কি?' শেষের প্রশ্নটা অবশ্য বাবার উদ্দেশ্যে।

বাবা এতক্ষণ চুপচাপ বসে গল্প শুনছিল। নড়েচড়ে উঠে বসল এবারে, 'তোদের জিওলজির মহুয়া? খুব ভালো গান গাইতো যে মেয়েটা? যার বাবা ডাক্তার ছিলেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ সেই মহুয়াই,' সায় দিলেন দীপুপিসি, 'ওর বাবা বিশ্বনাথ চৌধুরী আমাদের ওদিকে খুব পপুলার ডাক্তার ছিলেন। গ্রামের লোকে বলত বিশ্বনাথ ডাক্তার সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। মুখ দেখলে অর্ধেক অসুখ এমনিতেই সেরে যায়, ওষুধের খরচা বাঁচে! বিশ্বনাথকাকুকে অনেকবার দেখেছি কম্পাউন্ডার কাকুকে ডেকে গরিবগুর্বো পেশেন্টদের ফ্রি'তে ওষুধ দেওয়ার জন্যে বলে দিতে। এছাড়াও কতবার যে কতশত মরণাপন্ন রোগীকে বিশ্বনাথকাকু বাঁচিয়ে তুলেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। মহুয়াদের বাড়িতে আমাদের অবারিত দ্বার ছিল, প্রায়ই যেতাম। কতবার দেখেছি সারা রাত ধরে কোনও রোগীর দেখাশোনা করে কাকু ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে বাড়ি ফিরছেন। সারা হাবড়া-অশোকনগর জানত যে বিশ্বনাথ ডাক্তারের ভিজিট ছিল দু-টাকা, এবং সেটা না দিলেও ডাক্তারবাবু কিচ্ছুটি বলেন না! আমরা তো টাকার বদলে লাউ, কুমড়ো, এক বস্তা আলু, এসব নিয়েও গ্রামের লোকেদের উপস্থিত হতে দেখেছি। একবার তো এক মুসলিম ভদ্রলোক জ্যান্ত মুরগি নিয়ে হাজির, সে নিয়ে আবার আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সে কি হাসাহাসি..'

এইখানে এসে এবার সন্দীপন ওরফে স্যান্ডি সামান্য কাশতে বাধ্য হলো। যার মানে হচ্ছে, 'পিসি, গাড়ি বেলাইন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, ফিরে এসো, ফিরে এসো।'

পিসি খানিকক্ষণ ভুরুটুরু কুঁচকে স্যান্ডির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মানতেই হবে ছোকরা বড়ই ডেয়ারডেভিল, কথা না বাড়িয়ে একটা সাদা পান (অল্প কিমাম আর চমন বাহার দিয়ে) বাড়িয়ে ধরল পিসির দিকে। কারণ পুরো সল্টলেক জানে যে দীপুপিসিকে ঠান্ডা করতে হলে বিজে মার্কেটের দুখনিয়া দুসাদের নিজের হাতে বানানো স্পেশাল পানের জুড়ি নেই। সেই দেবভোগ্য পান মুখে দিয়ে পিসি যে কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হলেন সেটা পিসির মুখ দেখেই বোঝা গেল। খানিকক্ষণ খলরবলর করে পানটা চিবিয়ে পিসি বললেন, 'আহা, কলকাতা ছেড়ে গেলে একমাত্র এই লাক্সারিটাই আমি মিস করি খুব, বুইলি! তাপ্পর শোন।'

'মহুয়ারা এক ভাই এক বোন। মহুয়াই বয়সে বড়। ভাইয়ের নাম ছিল দীপাঞ্জন, লম্বামতো দোহারা চেহারা, খুব ভালো ফুটবল খেলত। পড়াশুনোতেও তুখোড় ছিল ছোকরা, পরে জয়েন্ট দিয়ে শিবপুরে মেকানিকালে চান্স পায়। সে যাই হোক, বিশ্বনাথকাকুরা অনেক দিন থেকেই ওখানকার বাসিন্দা। সম্পন্ন বনেদী ফ্যামিলি, সে এলাকায় চৌধুরীদের বাড়ি বলতে লোকে একডাকে চিনত। সে বাড়ির বয়েস তখনই একশোর ওপরে, ওদের এক পূর্বপুরুষের তৈরি। পরে শুনেছিলাম সেই ভদ্রলোক নাকি ঝাড়খণ্ডের নাগবংশী শাহদেও রাজাদের নায়েব ছিলেন। তখন অবশ্য ঝাড়খণ্ড হয়নি, বিহারের অংশ ছিল জায়গাটা। রাজারা যে ওঁকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন সে কথা বলাই বাহুল্য। কথিত আছে যে ঝাড়খণ্ডের রাতুতে শাহদেওদের যে রয়্যাল প্যালেসটা আছে, সেটা নাকি তাঁরই তত্ত্বাবধানে তৈরি, সে হবেও বা। আমাদের গল্পটা আসলে মহুয়াকে নিয়েই, তাই ওদের ব্যাপারে একটু বিশদে বলে নিলাম।

সে যাই হোক। আমরা তো কলেজ স্ট্রিট ঘুরে, কফি হাউসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে দেদার আড্ডায় মজে আছি, কফি হাউস প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে অথচ আমাদের যে বাড়ি যেতে হবে সে কথা খেয়ালই নেই। হুঁশ এল মহুয়ার কথাতেই, কথা বলতে বলতে একবার ঘড়িটা দেখে ধড়পড় করে উঠে পড়ে বলল, 'অ্যায় দীপু, আটটা প্রায় বাজে যে, বাড়ি যাবি না?'

তাড়াহুড়ো করে নীচে নেমে দেখি শীতের রাতে কলেজ স্ট্রিট ফাঁকা হয়ে এসেছে, প্রায় সব দোকানের ঝাঁপই বন্ধ। টিমটিম করে কয়েকটা ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলছে। আমরা তো লম্বা লম্বা পা ফেলে মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে এসে হাজির। ও মা, এসে দেখি চারিদিক শুনশান, কোত্থাও কিচ্ছুটি নেই! না একটা বাস, না ট্রাম, না রিকশা না কিচ্ছু। অত বড় রাস্তাটার দুদিকে দৃষ্টিসীমার শেষ অবধি জনমনিষ্যি তো দূর, এমনকী পশুপ্রাণী অবধি নেই! দেখে ভারি আশ্চর্য লাগল, কলকাতা শহরের বুকে সাড়ে আটটা এমন কিছু

রাত না, আরেকটু উজিয়ে গেলেই ধর্মতলা আর পার্ক স্ট্রিট, যেখানে হয়তো সন্ধে সবে শুরু হয়েছে। তবে এখানে এমন শুনশান কবরস্থান মার্কা অবস্থা কেন?

উত্তরটা পেলুম একটা ঠান্ডা জোলো হাওয়া গায়ে ঝাপটা মারতে। মাথা তুলে ওপরে তাকিয়ে দেখি আকাশটা কালো সীসের মতো ভারী হয়ে আছে, ঝড়বৃষ্টি নামল বলে। তাই রাস্তাঘাট এত ফাঁকা, এইবার বুঝলাম। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে শিয়ালদহ যাবো কী করে? রাস্তা বেশিদূরের নয়, কিন্তু সঙ্গে গাদাখানেক বইপত্তর আছে যে! অত ভারী ভারী বই নিয়ে এতটা হাঁটতে হবে ভেবেই যেন জ্বর এলো গায়ে!

এমন সময় হঠাৎ দেখি একটা হাতে টানা রিকশা টুংটাং করতে করতে কলেজ স্ট্রিটের মোড়ের দিক থেকে শিয়ালদা'র দিকে যাচ্ছে। দেখে খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু...'

এতটা বলেই পিসি চুপ করে গেলেন। স্যান্ডি একবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'কিন্তু কী পিসি?'

পিসি ভুরু কুঁচকে কী যেন একটা ভাবছিলেন। তারপর অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'আমি এখনও মাঝে মাঝে ভাবি সেদিন ঠিক কী দেখেছিলাম। চোখের ভুল? উঁ হু, মা বলত আমার নাকি শকুনের চোখ, এখনও চশমা ছাড়াই বহুদূর অবধি স্পষ্ট দেখতে পাই। তখন অল্পবয়সে অত ভুল দেখব? কী জানি?'

বলে ফের শুরু করলেন, 'কী দেখলাম জানিস? লোকটাকে দেখে আমার চকিতের জন্যে একবার মনে হল যে লোকটা যেন হঠাৎ করে আবির্ভূত হল। কথাটা আমি ঠিক বুঝিয়ে বলত পারব কি না জানি না, তবুও চেষ্টা করছি, বুঝলি? মানে ধর বাঁদিকটা পুরো ফাঁকা, দূরে দূরে এক একটা করে ল্যাম্পপোস্টের আলো টিমটিম করে জ্বলছে, তাদের আলোগুলো রাস্তার ওপরে সার্কেল তৈরি করেছে। দুটো আলোর সার্কেলের মাঝে মাঝে বেশ খানিকটা করে অন্ধকার। আমি ওদিকেই তাকিয়ে ছিলাম, সামনে পুরো ফাঁকা রাস্তা। মহুয়া কি একটা বলছিল সেটা শোনার জন্যে ঘাড়টা ডানদিকে একবার ঘুরিয়েই ফের বাঁদিকে তাকালাম। মনে হল লোকটা যেন একটু দূরের দুটো ল্যাম্পপোস্টের মাঝখানের সেই অন্ধকার জায়গাটা থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে এল। আমি তো অবাক? তারপর ভাবলাম সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি গেছে, বেজায় ক্লান্ত লাগছে, তাই হয়তো চোখে ভুলভাল দেখছি।

সে যাই হোক, মহুয়া তো লাফিয়ে উঠেছে রিকশাওয়ালাটাকে দেখে। ও চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই রিকশা, শিয়ালদা যায়েগা?' শুনে রিকশাওয়ালাটা ধীরেসুস্থে রিকশা থামাল, তারপর ডানদিকে মাথাটা ঘুরিয়ে একটা অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'যায়েগা দিদি, জরুর যায়েগা।'

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ আমার গা'টা যেমন কেমন যেন শিউরে উঠল। স্লেটে কখনও কাউকে লম্বা নখ দিয়ে আঁচড় কাটতে শুনেছিস? অবিকল সেই শব্দ। টিমটিমে আলোয়, বৃষ্টিভেজা জনমানবহীন সন্ধ্যায় সামান্য খোনা গলায় বলা চারটে শব্দ শুনে যেন আমার বুকের রক্তটা জমাট বেঁধে গেল!'

এইখানে দীপুপিসি একবার ফের থামলেন। এতটা শুনেই আমার গলার কাছটা ঘেমে উঠছিল। খেয়াল করলাম যে পলির হাতের নখগুলো আমার হাতে গেঁথে বসছে। আড়চোখে মৌ-এর দিকে তাকালাম, মেয়েটা যা বড় হাঁ করে আছে, তাতে ও এখন স্বচ্ছন্দে একটা বিগ ম্যাক কামড়াতে পারে! পাশের টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে একঢোঁক জল খেয়ে পিসি শুরু করলেন, 'মহুয়ার অবশ্য সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কীরে দীপু, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, চল চল..দেরি হয়ে যাচ্ছে যে, বলে আমাকে প্রায় টানতে টানতে রিকশার দিয়ে নিয়ে চলল। রাস্তাটা ক্রস করছি, আমার চোখ লোকটার দিকে, আর খেয়াল করছি যে লোকটা এক দৃষ্টিতে মহুয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। আর এমন তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে, আমি যে ওকে দেখছি সে দিকে ওর কোনও নজরই নেই।

আরও কাছে আসতে লোকটাকে আরও লক্ষ্য করলাম। লোকটার কোঁকড়ানো চুল, চ্যাপ্টা নাক আর ঘোর কালো গায়ের রং দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে লোকটা সাঁওতাল বা অন্য কোনও আদিবাসী মানুষ। কলকাতার রাস্তায় আজ অবধি যত রিকশাওয়ালা দেখেছি তারা সব্বাই বিহারি, আজ অবধি কোনও ট্রাইবাল মানুষকে এ কাজ করতে দেখিনি। ওখান থেকেই আমার খটকা লাগা শুরু। লোকটার গায়ে ওপরে কিছু

নেই, নীচে একটা খাটো নোংরা ময়লা ধুতি মতো পরে আছে। তবে এসব ছাড়া প্রথমেই যেটা নজরে আসে সেটা হচ্ছে লোকটার চোখ দুটো। এত জীবন্ত আর লাল সেই চোখদুটো যে চট করে দেখলে মনে হয় চোখের মাঝখানে যেন লাল টকটকে জ্বলন্ত কয়লা বসানো আছে। বাপ রে, সে কী ধ্বকধ্বক করে জ্বলতে থাকা দৃষ্টি। তারই সঙ্গে চোখদুটোর মধ্যে একটা চাপা উল্লাসের ছোঁয়া, যেন কোনও কারণে তার রাগ আর আনন্দ দুটোই যেন আর বাঁধ মানতে চাইছে না!

লোকটাকে তাই দেখেই আমার একটা অস্বস্তি হওয়া শুরু হল। তোরা তো জানিস, ভয়ডর জিনিসটা ছোটবেলা থেকেই আমার কম, তবুও অস্বস্তিটা এড়াতে পারছিলাম না। শুধু কাছে আসতে খেয়াল করলাম লোকটার বুকের বাঁদিকের একটু ওপরের দিকে, কণ্ঠার একটু নীচে একটা মোটা কাটা দাগ। মহুয়ার অবশ্য অতশত খেয়াল নেই। সে প্রায় লাফিয়ে উঠল রিকশায়, আমাকেও হাতে ধরে টেনে তুলল। তারপর টুংটুং করতে করতে রিকশাটা রওনা দিল শিয়ালদা'র দিকে।

সেই রাতটার কথা ভোলা খুব মুশকিল, বুঝলি! এখনও চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই। একদম ফাঁকা নির্জন রাস্তা, নেড়িকুত্তা অবধি নেই। কলকাতা শহরের কোনও রাস্তা যে রাত আটটা'টার সময়ে অত জনমানবহীন হতে পারে সেটা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। থেকে থেকে মেঘের চাপা গুরুগুরু গর্জন, আর ঝলকে ঝলকে বয়ে আসা ঠান্ডা হাওয়া আর এরই মধ্যে আধা-আলো আধা-অন্ধকারের মধ্যে রিকশায় চড়ে আমরা দুই বন্ধু যাচ্ছি শিয়ালদা'র দিকে।

হাওয়ার সঙ্গে কিছু ধুলো আর গাছের পাতাফাতাও আমাদের গায়ে এসে পড়ছিল বটে, তবে খানিকক্ষণ যাওয়ার পর খেয়াল করলাম যে, আরও একটা জিনিস আমাদের গায়ে উড়ে এসে পড়ছে বারবার।

ছাই!

কাগজ পোড়ানো ছাই না। কাঠ পুড়ে গেলে যে সাদা কালোয় মেশানো ছাই উড়ে বেড়ায়, সেই ছাই। অল্প অল্প করে সেই সূক্ষ্ম ছাইয়ের কণা উড়ে আসছে আমাদের দিকে, আর সেই ধূসর রঙের ছাইয়ে আস্তে আস্তে আমাদের সালওয়ার আর হাত মুখ ভরে যাচ্ছে। সামনে তাকালে দেখতে পাচ্ছি যে রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সেই হলদেটে আলোর মধ্যে থেকে ছোট্ট ছোট্ট ছাইয়ের কণা উড়ে আসছে আমাদের দিকে।

এত ছাই কোথা থেকে এল? প্রথমে বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকার পর যখন ধরতে পারলাম, এবং সে ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য, যে ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়!'

অরিজিৎ ফ্যাঁস- ফ্যাঁসে গলায় বলল, 'কেন পিসি?'

ফিসফিস স্বরে পিসি বললেন, 'কী দেখলাম জানিস? সেই ছাইগুলো উড়ে আসছে লোকটার গা থেকে! মানে সেই বাদলা হাওয়ার মধ্যে দিয়ে লোকটা রিকশা হাতে প্রায় উড়ে চলেছে, আর তার গা থেকে যেন হঠাৎ সেই ছাইয়ের দল ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে।

ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য লেগেছিল আমার কাছে, যে তোদের বলে বোঝাতে পারব না। অথচ নিজের চোখের সামনে ঘটছে ব্যাপারটা, ও কিছু নয়—বলে উড়িয়ে দিতেও পারছি না! কী করব সেটা ভাবতে ভাবতেই দেখি ততক্ষণে বৈঠকখানা বাজারের কাছাকাছি এসে গেছি। একটু দূরে দেখতে পাচ্ছি দোকানের আলো, লোকজনের চলাফেরা। দেখে বুকে বেশ কিছুটা বল এল। আর ঠিক সেই সময়েই পথের ধারে সাইড করে রিকশার হ্যান্ডেলটা নীচে নামিয়ে রাখল লোকটা।

মহুয়া তো অবাক! ও বলল, সে কি? আর যাবে না?

সেই স্লেটের ওপর আঁচড় কাটার মতো ক্যারক্যারে গলায় জবাব এল, 'নেহি।'

মহুয়া তর্ক করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার এই লোকটার সঙ্গ আর একটুও পছন্দ হচ্ছিল না। আমি বললাম, ছাড় না মৌ, টাকা দে আর চল। এসেই তো গেছি। বলে রিকশা থেকে নেমে একটা পাঁচটাকার নোট সিটের ওপর প্রায় ছুঁড়ে দিয়েই আমরা ঘুরে দাঁড়ালাম হাঁটা লাগাব বলে।

আর ঠিক সেই সময়ে লোকটা সেই গায়ের রোম খাড়া করে দেওয়া গলায় ফিসফিস করে শুধু দু-বার বলল, কালিয়া মাসান, কালিয়া মাসান।

মহুয়াই থমকালো প্রথমে। কী বললে? বলে ঘাড়টা ঘুরিয়েই ও অবাক স্বরে বলল, এ কি! লোকটা গেল কোথায়? উধাও হয়ে গেল নাকি?

আমি আর দাঁড়াইনি, শক্ত করে মহুয়ার হাতটা চেপে ধরে দ্রুত হাঁটা লাগিয়েছিলাম স্টেশনের দিকে।

এখন আফশোস হয়, তখন যদি একটু সতর্ক হতাম, মহুয়াকে অত বড় বিপদের মধ্যে পড়তেই হত না কোনওদিন। অবশ্য আমারও হয়তো ভৈরবীমায়ের সঙ্গে দেখাটা কোনওদিন হত না।'

রাতের অন্ধকারে লোকটা যখন গামছাতে মাথা অবধি মুড়িয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লয়েডের বাংলোয় এল তখন চারিদিকে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। ব্রিগেডিয়ার লয়েড তখন ডিনার সেরে দামি মুর্শিদাবাদি সিল্কের গাউন পরে অত্যন্ত বিরক্তমুখে চুরুট খাচ্ছিলেন। ইন্ডিয়ার মনসুন কোনওদিনই ওঁর পছন্দ নয়, নেহাত ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি ভালো পয়সা দিচ্ছে তাই এই গড ফরসেকেন কান্ট্রিতে থাকতে আসা। তার ওপর সারাদিন ধরে এই এক ঘ্যানঘেনে বৃষ্টিতে তাঁর মেজাজ টঙে চড়ে ছিল। নইলে কোথায় স্কটিশ হাইল্যান্ড, আর কোথায় এই রাজমহলের জঙ্গল। বিরক্তি আর রাগে গরগর করছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ সমরনায়ক জেনারেল লয়েড।

এমন সময় খাস খানসামা মুনাব্বর খাঁ এসে এত্তেলা দিল, 'চওধরী সাব আয়ে হ্যাঁয়।'

হাত নেড়ে দর্শনপ্রার্থী লোকটিকে তাঁর খেদমতে পেশ করতে বললেন জেনারেল লয়েড, তারপর নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন।

আবহাওয়া ভালো না, একদমই ভালো না। ভাগলপুর থেকে শুরু করে বীরভূম, বস্তার থেকে রাজমহল, পুরো ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকাটাই যেন এখন আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছে। এই এলাকা সাঁওতালদের এলাকা, তাদের মধ্যে বিদ্রোহের চাপা আঁচ ধিকিধিকি জ্বলতে জ্বলতে আজ ভিসুভিয়াস হয়ে ফেটে পড়ার উপক্রম। চারিদিকে বারুদের গন্ধ, বিদ্রোহের ধ্বনি। এই জঙ্গলের হাওয়ায় হাওয়ায়, পাতায় পাতায় কান পাতলে শোনা যাচ্ছে রক্তমাতাল করা সেই ডাক।

হুল। হুল জোহার।

কম্পানীর পোষা গুপ্তচরেরা এই ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত হওয়ার মতো রিপোর্ট পাঠাচ্ছে বারবার। সেসব ব্যাপারে বিশদে খবরাখবর জানতেই আজ এই গোপন রঁদেভু'র আয়োজন।

বেঁটেখাটো চেহারার লোকটা ঘরে ঢুকেই আভূমি প্রনত হয়ে সেলাম ঠুকলো, 'সেলাম সাহিব।'

লোকটাকে একদম পছন্দ করেন না জেনারেল লয়েড, টাকার জন্যে যারা স্বদেশবাসীর সঙ্গে বেইমানি করে তাদের পছন্দ করার কথাও না। কিন্তু লোকটা ক্ষমতাশালী, তার ওপর এই এলাকার নেটিভ সাঁওতালদের অনেক খবরাখবরও রাখে। নেহাত বাধ্য হয়েই লোকটাকে প্রশ্রয় দেন তিনি। ইচ্ছে আছে যে এইসব ঝামেলা শেষ হলে একদিন কোনও একটা ছুতোনাতায় লোকটাকে ধরে কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেবেন তিনি। তবে ব্রিগেডিয়ার লয়েড ঝানু সমরবিদ, মনের মধ্যে ঝড় বয়ে চললেও মুখে প্রকাশ করেন না। দিব্যি সভ্যভব্য ভাবে আপ্যায়ন করলেন এই নিশিরাতের অতিথিকে। চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে মধুর হাসিতে ভুবন ভরিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ওয়েল বাবু, এত রাতে এসেছো যখন, কোনও ইম্পর্ট্যান্ট খবর নিয়েই এসেছো পাক্কা। কী সেই খবর বাবু? টেল মি।'

'অবস্থা খুব খারাপ সাহেব, হাওয়া খুবই গরম। যে কোনওদিন এই সাঁওতালরা আমাদের, মানে বাঙালি জমিদার, নায়েব, মহাজন এদের ওপর চড়াও হতে পারে। এই এলাকার সব মাড়োয়াড়ি আর বাঙালি

মহাজনেরা আমাকে ধরে বসেছে আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। হুজুর আমাদের মাই বাপ, কিছু তো নিশ্চয়ই করবেন।'

'কিন্তু হঠাৎ এরা এরকম ক্ষেপে গেল কেন বাবু? কিছু তো কারণ আছেই?''সে তো আছেই সাহেব। শুধু শুধু আর মানুষে এতটা ক্ষেপে যায়? দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে তো নিরীহ বেড়াল অবধি পালটা মার দেয়। আর এরা তো মানুষ।'

'কিন্তু দেওয়ালে পিঠ ঠেকেই বা গেল কেন?'

'পেটে লাথ পড়লে মানুষের আর কীই বা করার থাকে সাহেব? নিজের জায়গা, জমিন, ঘরবাড়ি যদি বেদখল হয়ে যায়...'

অধৈর্য হলেন ব্রিগেডিয়ার লয়েড, 'আহ, বড় বাজে বকছো বাবু। এদের এত রেগে যাওয়ার কারণটা খুলে বলো তো দেখি আগে।'

'কারণ তো আপনারাই সাহেব।'

জেনারেল লয়েডের মুহূর্তের জন্যে মনে হল তাঁর বন্দুকটা এনে লোকটাকে এখানেই নিকেশ করে দেন। সাহস দেখো এই বজ্জাত বাঙালিটার, তাঁরই সামনে বসে তাঁদেরই দোষারোপ করছে? মনের রাগ মনেই চেপে রাখলেন তিনি, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন 'হোয়াই বাবু, এরকম বলছো কেন?'

খিক খিক হাসলেন চণ্ডধরী সা'ব, এই হাসিটা শুনলেই জেনারেল লয়েডের গা জ্বলে যায়, তিনি অপলক চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'সে কী সাহেব, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা এ দেশে কারা চালু করেছিল? আপনারা নন?'

বাঘাটে চোখে চেয়ে থেকে একটা হুঙ্কার ছড়লেন জেনারেল লয়েড, 'তো?'

খিক খিক করে ফের সেই গা জ্বালানো হাসি, 'তা সাহেব এই সব জায়গাজমি যখন একধার থেকে বাইরের লোকের হাতে তুলে দিলেন, একবারও ভেবেছিলেন, এই সাঁওতালরা জমির খাজনা দেবে কী করে?'

'বাকিরা যা করে দেয়, পুরো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি যে ভাবে দেয়, সেভাবেই দেবে।' জেনারেল লয়েডের স্বরে বিরক্তি আর উষ্মা গোপন থাকছিল না।

লোকটার হাসি এবার সহবতের বাঁধ ভেঙে দেয়, 'ওখানেই তো ভুলটা করেছেন, পুরো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি টাকায় খাজনা দেয়। অথচ আপনারা খেয়াল করেননি যে এই সাঁওতালদের মধ্যে টাকাপয়সার ব্যাপারটাই নেই। এরা জিনিসের বদলে জিনিস কেনে। এরা টাকা পাবে কোথা থেকে সাহেব?'

কিছু বললেন না লয়েড। স্থির চোখে চেয়ে রইলেন।

একটু নীচু হয়ে ফিসফিসিয়ে বলল লোকটা, 'কখনো ভেবেছেন সাহেব, এরা টাকা কোথা থেকে পায়?'

বক্তব্যটা আস্তে আস্তে প্রণিধান হচ্ছিল লয়েডের। তিনি কিছু বললেন না, শুধু গম্ভীর মুখে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন।

লোকটার স্বরে এবার আর বেয়াদবির আভাস আটকানো গেল না, 'এবার ভেবেচিন্তে বলুন দেখি সাহেব, এদের হাতে খাজনা দেওয়ার টাকা আসে কোথা থেকে?' ফের সেই ধূর্ত শিয়ালের মতো হাসি, 'আমরা দিই, আমরা। লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকেরা।'

'তারপর?'

খিক খিক হাসিটাকে বরদাস্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবার, 'তারপর? তারপর আর কি? আমরা এসেই দেখলাম যে ব্যাটাচ্ছেলেগুলো পড়াশোনা দূরে থাক, গুণতে অবধি শেখেনি! ক'পয়সায় একমণ ধান হয় সেটা অবধি জানে না!'

ব্যাপারটা এবার উপলব্ধি হল লয়েডের। তিনি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন।

'তারপর কী সেটা জিগ্যেস করবেন না সাহেব? আপনি পারেনও বটে! বলি এইসব অসভ্য সাঁওতালের বাচ্চারা লেখাপড়া জানে নাকি যে হিসেব নিকেশে আমাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে? তবে বলতে নেই সাহেব, এই আপনাদের দৌলতেই কিন্তু আমাদের হাতে দু'পয়সা আসছে বেশ। ব্যাটারা এক্কেবারে গোমুখ্যু, হিসেবনিকেশ কিছুই বোঝে না। এটা ওটা হাতিয়ে নিতে কোনও কষ্টই নেই।'

'মাই গুডনেস,' অস্ফুটে উচ্চারণ করেন লয়েড।

'শুধু কি তাই? এই বুনোগুলো না থাকলে চাষআবাদ করবে কে এই এলাকায়, আর জঙ্গল কেটে বসতিই বা বসাবে কারা? আমরা ভদ্রলোকেরা করব নাকি ওসব? তবে শক্ত লোক বটে এরা, যেমন কড়া জান তেমনই গায়ে শক্তি, শুধু দু'বেলা দুটো খেতে দিতে হয় এই যা। ভুলিয়েভালিয়ে একবার ফাঁদে ফেলার ওয়াস্তা ব্যস। তারপর বাপ, ছেলে, তার ছেলে, এইভাবেই খাটিয়ে নিয়ে যাও, সস্তায় এমন মুনিষ আর কোথাও পাবেন না সাহেব, এই লিখে দিলাম।

'বন্ডেড স্লেভস!' স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ব্রিগেডিয়ার লয়েড।

আবার সেই খিক খিক হাসি, 'আপনাকে বলতে বাধা নেই সাহেব, এই আপনাদের দয়াতেই দেশ গাঁয়ে বেশ কয়েক বিঘে জমি আর পাকা একটা ভদ্রাসন বানিয়েছি। মালিক যেদিন কর্ম থেকে অব্যাহতি দেবেন, দেশে ফিরে একেবারে জমিয়ে বসবো ভাবছি।'

রাগে গা'টা রি-রি করছিল জেনারেল লয়েডের, 'কিন্তু এরা তোমাদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করে না কেন?' গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন তিনি।

লোকটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে, তারপর কোত্থাও কিচ্ছু নেই হো-হো করে বিপুল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। চোয়াল শক্ত করে সেদিকে চেয়ে রইলেন প্রবীণ সেনাপ্রধান। তারপর বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে চোখের জল মুছেটুছে সুস্থির হল লোকটা, 'উফ, হাসিয়ে প্রায় মেরে ফেলছিলেন সাহেব। দোহাই, অমন রসিকতা আর করবেন না, পায়ে পড়ি আপনার। উফ, বাপ রে, আরেকটু হলে পেট ফেটে যাচ্ছিল। বলি সাহেব, আপনাদের ম্যাজিস্টর সাহেব বসেন কোথায়? আদালতটা কোথায়? হুইইই ভাগলপুর। বলি কখনও ভেবেছেন এখান থেকে অদ্দূর যাবে কী করে গুয়োর ব্যাটারা? গেলেও বা, মুনশি, পেশকার, মুনিম এসব সামলে সুমলে হাকিমের সামনের দাঁড়িয়ে মনের কথা গুছিয়ে বলবেই বা কী করে? এসব কোনওদিন ভেবে দেখেছেন সাহেব? এখন জিগ্যেস করছেন ওরা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যায় না কেন? উফ, কী প্রশ্নই না করলেন সাহেব। হাসতে হাসতে মরেই যাচ্ছিলাম প্রায়...' লোকটার সেই বিশ্রী খিকখিক হাসি শেষই হতে চায় না আর!

সরু চোখে এই বেয়াদবিটা দেখছিলেন লয়েড। তাঁর ধৈর্য প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে তখন। দাঁতে দাঁত ঘষে নিলেন একবার, তারপর হিম শীতল কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, 'এইসব বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথায় এসো বাবু। বারুদের স্তূপে আগুনটা লাগাচ্ছে কে বা কারা সেটার ব্যাপারে কিছু বলবে?'

এইবার সাপের মতো চাউনি দিয়ে সামনে তাকাল লোকটা। অসমসাহসী জেনারেল লয়েডেরও বুকটা একবার কেঁপে উঠল সেই চাউনির সামনে। মনে হল একটা ধূর্ত গোখরো যেন সহসা ফণা তুলে দাঁড়াল তাঁর সামনে।

প্রায় সাপের মতোই হিসহিসে গলায় বলল লোকটা, 'এই পাকুড় থেকে সাড়ে আঠাশ ক্রোশ উত্তরে ভোগনাডি বলে একটা গ্রাম আছে, তার নাম শুনেছেন সাহেব?'

এদেশে লক্ষ লক্ষ গ্রাম আছে, এই রাজমহলেই আছে কয়েকশো। সব গ্রামের নাম জানা লয়েডের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি চুপ করে রইলেন।

'সেই গ্রামের বাসিন্দা চুলু সাঁওতালের চার ছেলে, দুই মেয়ে। ওরা জাতে মুর্মু,স্যাঁওতালদের ঠাকুর আর বোঙাদের পুজো করাই ওদের কাজ। কয়েক মাস আগে পুরো রাজমহল এলাকায় দাবানলের মতো একটা খবরটা ছড়ায়। খবরটা এই, যে ঠাকুর নিজে এসে নাকি ওদের বড় দুই ছেলেকে দর্শন দিয়েছেন। বলেছেন

এই দিকু জমিদার, ব্যবসায়ী আর মহাজনদের খেদিয়ে দিয়ে সাঁওতালদের নিজের দেশ প্রতিষ্ঠা করতে। দামিন-ই-কোহ নামটা শুনেছেন সাহেব?'

'না', জেনারেল লয়েডের মুখটা ক্রমেই থমথমে হয়ে উঠছিল।

'ওটার মানে হল সাঁওতালদের নিজের দেশ। যত মাঝি, জগমাঝি, আর পারাণিক আছে তারা সবাই শালগাছের ডাল নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলছে এই দেশ, এই জঙ্গল, এই পরগনা সাঁওতালদের, ওঁরাওদের, মুণ্ডাদের, এই সম্পদে বাইরের কারও কোনও অধিকার নেই। বলছে অন্যায়ভাবে জারি করা খাজনা আর ধার নেওয়া টাকার ওপর সুদ দেবে না ওরা।'

সুদ দেবে না? জঙ্গল আর জমিন ওদের? মানে খাজনাও দেবে না? এইবার সোজা হয়ে বসলেন জেনারেল লয়েড। এসবের মানে হচ্ছে যে জমিন্দারবাবুদের হাতে টাকা আসবে না, অর্থাৎ জমিন্দারদের ক্ষতি। আর একথা কে না জানে যে জমিন্দারদের ক্ষতি মানে কোম্পানির ক্ষতি? তিনি কোম্পানির বেতনভুক ভৃত্য হয়ে এই কাজ হতে দিতে পারেন কি? অবশ্যই না, কিছুতেই না!

লোকটার ফিসফিসানি আরও গাঢ় হয়ে আসে, 'কয়েকদিন পরেই পাঁচখেতিয়াতে ওদের একটা খুব বড় জমায়েত হবে সাহেব। সেখান থেকে ওরা নাকি কলকাতা যাবে দরবার করতে। হাজারে হাজারে ওরা জড়ো হচ্ছে, যে কোনওদিন আগুন জ্বলে যেতে পারে সাহেব।'

ট্রাইবালসগুলো কলকাতা অবধি যেতে পারে শুনেই জেনারেল লয়েডের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল। লর্ড ডালহৌসি কড়া ধাঁচের মানুষ, এদিককার গন্ডগোলের আঁচ বিন্দুমাত্র ওদিকে পড়লে লয়েডের পরের পোস্টিং আফ্রিকাতে হওয়াও বিচিত্র নয়। তাছাড়া এই এলাকায় রেল লাইন পাতার কাজও চলছে, এর ওপর গভর্নর জেনারেল নিজেও কড়া নজর রেখেছেন। সে বিষয়েও যে কোনওরকম শৈথিল্য বরদাস্ত করা হবে না সেটাও উনি ভালো করেই জানেন।

এই আগুন ভালো করে জ্বলে ওঠার আগেই নেভাতে হবে, যে কোনও মূল্যে!

লোকটার সামনে ঝুঁকে এলেন তিনি, 'হুমম। তা তুমি আমাদের জন্যে কী কী করতে পারো বাবু?'

ধূর্ত কুটিল চোখে চেয়ে রইল লোকটা, তারপর খিক করে হেসে বলল, 'কম্পানি আমার জন্যে কী কী করতে পারে আগে সেইটে বলুন দিকি সাহেব।'

'ওই চারটে ভাইকে ধরিয়ে দিতে পারবে?' সোজা কথা সোজাই বলেন জেনারেল লয়েড।

'তার বদলে?' হিসহিস করে উঠল লোকটার স্বর।

'প্রত্যেক ভাইয়ের জন্যে দশ হাজার রুপেয়া ইনাম। ডেড অর অ্যালাইভ, চারটেকেই চাই।'

টাকার কথা শুনে লোকটার চোখদুটো যেন ধ্বক করে উঠল, এমনটাই মনে হল লয়েডের, 'হয়ে যাবে সাহেব। তবে ছোট দুটোকে ধরে লাভ নেই। পালের গোদা হচ্ছে বড় দুটো, ও দুটোকে ধরিয়ে দিলেই কিন্তু চল্লিশ হাজার আমার চাই সাহেব, সে ব্যবস্থা করে দিতে হবে আপনাকে।'

'আর দে সো স্পেশ্যাল?'

'বলছেন কি সাহেব? ওদের চেনেন আপনি? ওদের একডাকে হাজারে হাজারে সাঁওতাল এককাট্টা হচ্ছে, বুকের রক্ত দিতে রাজি হচ্ছে, বুঝতে পারছেন না ওদের শক্তি? আমি ওদের চিনি সাহেব, ছেলেদুটোর যেমন সাহস তেমন শক্তি। ওই দুইভাই যতক্ষণ বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, জেনে রাখুন সাহেব, একটাও সাঁওতাল লড়াইয়ের ময়দান ছাড়বে না। ও দুটো সাচ্চা মরদ সাহেব, একেবারে বাঘের বাচ্চা।'

'পারবে তো বাবু? নাকি আমাদের অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে?'

ফের সেই খিকখিক হাসি, 'হরনাথ চৌধুরী মিথ্যে আশ্বাস দেয় না সাহেব। বলেছি যখন, কাজ হয়ে যাবে। তবে আমাকে কিন্তু সময় দিতে হবে সাহেব, খুব সতর্ক হয়ে এগোতে হবে। আপনি আপনার সেপাইদের জোগাড় করুন, কারণ লড়াইটা আটকানো যাবে না। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের ব্যবস্থা করছি।'

উঠে পড়লেন কুশলী সমরবিশেষজ্ঞ জেনারেল লয়েড, কালই ক্যাপ্টেন শেরউইলকে ডেকে নিতে হবে। সাত নম্বর আর চল্লিশ নম্বর নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টকেই তলব করলে চলবে আপাতত। অনেক কাজ সামনে।

দেখাদেখি লোকটাও উঠে পড়েছিল। সেলাম ঠুকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় কী একটা মনে পড়াতে ঘুরে দাঁড়ালেন লয়েড, বললেন, 'আরে ওই চুলু সাঁওতালের ছেলেগুলোর নামই তো বললে না বাবু। কী নাম ওদের?'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন শাহদেও রাজবাড়ির নায়েব, ধূর্তশিরোমণি হরনাথ চৌধুরী। ঠোঁটটা সামান্য বেঁকিয়ে বললেন, 'ছোট দুটোর নাম চাঁদ আর ভৈরব।' তারপর একটু থেমে, যোগ করলেন, 'ওদের দরকার নেই এখন, আপাতত বড় দুটোর নাম মনে রাখবেন সাহেব, ওদেরই আগে ধরা দরকার। ওদের নাম সিদহো আর কানো। সিদহো মুর্মু আর কানো মুর্মু।'

'জায়গাটা ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল আর আজকে যেটাকে আমরা ঝাড়খণ্ড বলি,তার একদম সীমান্তে, বুঝলি?' তিন নম্বর পানের খিলিটা মুখে পুরে ফের গল্পটা শুরু করলেন দীপুপিসি।

এতক্ষণে বিকেল হয়ে এসেছে, এক রাউন্ড চা হয়ে গেছে অলরেডি। দীপুপিসি আবার চা কফি খান না একেবারেই, পিসির মৌজ হচ্ছে ওই দুখানিয়ার হাতের পানে। সেইটে চিবোতে চিবোতে পিসির চোখ আরামে মুদে এল প্রায়, মুখেচোখে ফুটে উঠল স্বর্গীয় আভা। ততক্ষণে আমরা চা দিয়ে একরাউন্ড পেঁয়াজি মেরে দিলাম। তারপর মা এসে যখন বলল এরপর বাদামভাজা দিয়ে চালভাজা আসছে, তখন আমাদের আর পায় কে?

উল্লাসে সবাই মিলে বেশ ঘন হয়ে বসতেই পিসি শুরু করে দিলেন, 'জায়গাটার নাম হচ্ছে বাঁশিডি। অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে একটা ছোট্ট গঞ্জ মতো। বরাভূম স্টেশনে নেমে, পুরুলিয়া বাঘমুণ্ডি রোড ধরতে হয়। বলরামপুর টাউন পেরিয়ে ঘণ্টাদুয়েকের রাস্তা। বাঘমুণ্ডি পৌঁছবার আগে মাঠাবুরু বলে অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে একটা গ্রাম আছে, তার কাছেই এই জায়গাটা। তার সিনিক বিউটি নাকি আচ্ছা আচ্ছা বিদেশি ট্যুরিস্ট স্পটের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, এমনই জানিয়েছিলো দীপাঞ্জন, আমাদের এই আউটিং-এর আইডিয়াটা ওরই। থাকার মধ্যে একটা ব্রিটিশ আমলে বানানো ফরেস্ট বাংলো। ওইটেই ছিল আমাদের আস্তানা।

জিওলজির ফিল্ড ওয়ার্ক টিমের বাকিরা অবশ্য তার আগেই কাজ সেরে নিয়ে কলকাতা ফিরে গেছে। ফিল্ড ওয়ার্কের সময় আমরা ছিলাম বলরামপুরে। দলে সবশুদ্ধ ছিল জনা পঁচিশেক, দুজন প্রফেসর আর তেইশজন স্টুডেন্ট। জিওলজির ফিল্ড স্টাডি যে কী টাফ সে আর কী বলব, যে না করেছে সে বুঝতে পারবে না। তবে তার আকর্ষণও অন্যরকম, মানতেই হবে। দশটা দিন যে কী করে আড্ডা গল্পগুজব আর হাসি ঠাট্টায় কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। কোথায় কোথায় গেছিলাম আজ আর মনে নেই, শুধু নেকরে, সিরিঙ্গি আর বেরসা এই তিনটে জায়গার নাম খুব মনে আছে।

তা ফিল্ড স্টাডি শেষ, বাকি লোকজন কলকাতা ফিরে গেছে। আমি আর মহুয়া থেকে গেলাম।

আমাদের আগেই প্ল্যান করা আউটিঙের জন্যে। বাংলোটা অবশ্য দৌড়োদৌড়ি করে দীপাঞ্জনই ঠিক করে দিয়েছিলো। এখন শুনেছি ওখানে একটা দুটো রিসর্ট টাইপ হয়েছে বটে, আমাদের সময়ে ওই ফরেস্ট বাংলোটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তার ওপর সেখানেও জায়গা পাওয়া ছিল ভেরি টাফ। আমরা যে জায়গা পেয়ে গেছিলাম বেশি চেষ্টাচরিত্র না করেই তার একটা কারণ আছে, সেটা পরে বলছি। তবে সে বছর হাতির উৎপাত একটু বেশি হওয়াতে অনেকে এমনিতেই জায়গাটা এড়িয়ে চলছিলেন। সত্যি বলতে কি, সেই বছরে বাঁশিডির ফরেস্ট বাংলোতে শীতের সিজন শুরু হওয়ার মুখে আমরাই ছিলাম প্রথম ট্যুরিস্ট।'

'অবশ্য শুধু যে আমরা দু'জন ছিলাম তা নয়, মহুয়ার ভাই দীপাঞ্জনের কথা তো আগেই বলেছি, সেও এসে আমাদের জয়েন করেছিল। ওর তখন সবে উচ্চমাধ্যমিক শেষ হয়েছে, হাতে অঢেল সময়। হেমন্তের শেষে আর শীতের শুরুতে নাকি জঙ্গলের একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য দেখা যায়, সেইসব শুনেই ওরই পরামর্শে প্ল্যানটা বানানো। দীপাঞ্জনেরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাবা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ছিলেন, তাঁকে ধরেবেঁধে ওই ফরেস্ট বাংলোয় থাকার অনুমতি পাওয়া যায়। ওর সেই বন্ধুর পৈতৃক বাড়িও ছিল পুরুলিয়াতেই, মানবাজারে। ছোকরার নাম হল জোশুয়া হেমব্রম। আগে যে পিটার হেমব্রমের নাম বলেছি, সে ওই জোশুয়ার দাদা।

আগেই বলে বলেছি যে ফরেস্ট বাংলোটা যেতে হয় বাঘমুণ্ডি পুরুলিয়া রোড ধরে। মাঠাবুরুতে নেমে দশ পনেরো মিনিটের একটা হাঁটাপথ। বরাভূম স্টেশনে নেমে, ট্রেকার ধরে দীপাঞ্জন যখন বলরামপুর এসে পৌঁছল, তখনই প্রায় দুপুর তিনটে বাজে। আমরা লাঞ্চ করে রেডিই ছিলাম। দীপাঞ্জনকে লাঞ্চ করিয়ে টরিয়ে, বাজার থেকে ঝটপট করে চাল, ডাল, তেল আর আলু কিনে যখন বুধন হাঁসদা'র ভাড়া করা টেম্পোতে চেপে রওনা দিলাম, তখনই বাজে প্রায় পাঁচটা।

পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সাড়ে সাতটা বেজে গেলো। তোদের মধ্যে যারা কখনও পুরুলিয়া গেছিস, তারাই জানবি যে ওখানকার শীতের সময়ে রাতের আকাশ কী চমৎকার। দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, মাথার ওপর সলমা জরি বসানো নীলচে কালো মখমলি আকাশ, দুপাশে শাল, পলাশ আর কেঁদ গাছের জঙ্গল, মস্ত বড় একটা অজগরের মতো শুয়ে থাকা রাস্তা, আর তার ওপর দিয়ে জন্ডিস কালারের হেড লাইট জ্বালিয়ে চলছে এক পুরোনো টেম্পো আর তাতে আমরা তিনজন বসে আছি নির্বাক হয়ে। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি, বুঝলি?

মাঠাবুরুতে জুনিয়র হাইস্কুলের মোড়ে আমাদের নামিয়ে দিয়ে বুধনদা ফিরে গেলো। অ্যাদ্দিন ধরে আমরা বুধনদা, বুধনদা'র ছোট ভাই মংলু আর তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের টেম্পোতে চড়েই ফিল্ড ভিজিটে গেছি, ফলে বুধনদা'র সঙ্গে আমাদের একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হয়েই গেছিল। বুধনদা আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার আগে যেটা বলে গেল তার মর্মার্থ হচ্ছে যে, এই ফরেস্ট বাংলোর কেয়ারটেকার রেংতা কিস্কু অতি চমৎকার ছেলে, তার বাড়ি বুধনদা'র শ্বশুরবাড়ির গাঁ'য়েই। ফলে তার স্বভাবচরিত্র তথা রন্ধনকুশলতার ব্যাপারে আমরা যেন নিশ্চিন্ত থাকি। আর প্রত্যেক দুদিন অন্তর বুধন'দা নিজে এসে একবার আমাদের খবর নিয়ে যাবে।

অতি উত্তম প্রস্তাব, ফলে আমরা তিনটি মনিষ্যি হাসিমুখে বুধনদা'কে থ্যাঙ্ক ইউ ট্যাঙ্ক ইউ বলে সেই ফরেস্ট বাংলোর দিকে রওনা দিলাম।

এখনও যখন সেই ঘটনাগুলোর কথা মনের মধ্যে আসে, শুধু এইটুকু ভাবি যে সেইদিন, সেই ক্রাইসিস মোমেন্টে বুধনদা তার কথা মতো আমাদের খোঁজ করতে না এলে কিই না হতে পারত?

সে যাই হোক, আমরা তো তিনজনে সেই ভাঙা সুঁড়িপথ ধরে হাঁটা দিলুম। আকাশে কড়ে আঙুলের নখের ফালির মতো একটুখানি চাঁদ, টুকরোটাকরা হীরের কুচির মতো তারায় ভরানো একটা অসম্ভব পরিষ্কার আকাশ, চারিদিকে বুনো ফুলের মিষ্টি গন্ধ আর ঝিঁঝি পোকার ডাকের মধ্যে হাতে বড় বড় টর্চ জ্বালিয়ে যখন বাংলোর দরজায় পৌঁছলুম তখন আমার ঘড়িতে বাজে রাত আটটা।

রেংতা কিস্কু জানতোই যে আমরা আসব। ফলে আমরা যখন দেখলাম যে হাতে একটা একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে একটা বেঁটেখাটো কালোমতো লোক হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে, তখন বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হইনি।

রেংতা আমাদের দেখে সেলাম টেলাম ঠুকে তো একশা। লোকটার বয়েস বছর পঁয়ত্রিশ, সুঠাম চেহারা আর মুখে একটা থাউজ্যান্ড ওয়াটের স্মাইল, এই দেখেই আমাদের দিল তর হয়ে গেসলো। তার ওপর আমাদের কিনে আনা বাজারপত্তর দেখে তার খুশি আর ধরে না!

সে যাই হোক। একতলা বাংলো, সামনে একটা বড়ো আর একটা ছোট ঘর, পেছনেও তাই, সব মিলিয়ে এই চারটি ঘর। মেইন গেট থেকে মোরাম বিছোনো পথ হেঁটে আসার পর কয়েকধাপ সিঁড়ি, তারপর বেশ

চওড়া একটা বারান্দা আর বারান্দার শেষেই সামনের দুটো ঘরের পাশাপাশি দুটো দরজা। আমরা বারান্দায় আমাদের লাগেজ নামিয়ে রেংতাকে জিগ্যেস করলাম, 'কী গো, কোন কোন ঘরে থাকবো?' ঝকঝকে সাদা দাঁত বার করে একগাল হেসে হিন্দি, বাংলা, সাঁওতালি মিশিয়ে সে জানালো সব ঘরই খালি আছে, আমরা যেটা খুশি সেটা নিতে পারি।

আমাদের অবশ্য পছন্দ হল পেছন দিকের ঘর দুটো। জানলা খুললেই চাপা চাপা অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিশাল অযোধ্যা পাহাড়। তার মাথার ওপর সেই ছোট্ট একফালি চাঁদ। প্রথমে ঢুকেছিলাম ছোট ঘরটায়। দীপাঞ্জন তো বিছানা দেখেই সটান শুয়ে পড়ল। বলল, 'আমার আর শরীরে দিচ্ছে না। তোমরা ফ্রেশটেশ হয়ে নাও, তারপর ডিনারের জন্যে ডেকো।'

স্নানটান করে ফ্রেশ হতে হতে তার ন'টা বেজে গেল। এখানে জানিয়ে রাখা ভালো যে বাংলোটা ব্রিটিশ আমলে তৈরি। পুরোটাই শালকাঠের, মায় মেঝেটা অবধি। উঁচু উঁচু সিলিং, ফোর পোস্টার বেড, মেহগনি কাঠের তৈরি রাইটিং ডেস্ক, সব মিলিয়ে রাজকীয় ব্যাপার। সেই অঞ্চলে তখন সবে ইলেট্রিসিটি এসেছে। তাও সন্ধে হলেই বড় বড় লণ্ঠন বা হ্যাজাক জ্বালানোর জন্যে তৈরি থাকতে হত। ওখানে তখন সন্ধে মানেই রাত, সাতটার সময় সব শুনশান, রাস্তায় জনমনিষ্যির দেখা নেই। আমাদের অনভ্যস্ত শহুরে চোখে প্রথমে প্রথমে অদ্ভুত লাগত, পরে বুঝেছিলাম যে ওই অঞ্চলে ওটাই স্বাভাবিক।

তবে এসব অসুবিধা ভুলিয়ে দিয়েছিল পুরুলিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য। দিনের পর দিন ওই অঞ্চলে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে করতে জায়গাটার সঙ্গে আমার বেশ একটা সখ্য গড়ে উঠেছিল। দিনের বেলার রোদটা নরম মোমের মতো গায়ে লেগে থাকে। আর বিকেল নামার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতো জায়গাটা বদলে যায়। মিঠে বাতাস, মহুয়াফুলের মিষ্টি গন্ধ, শাল, কেঁদ আর পলাশ বনের নয়নশোভন জঙ্গল, আর অজস্র নাম না জানা পাখিদের ওড়াউড়ি, আমার তো থাকতে থাকতে নেশাই ধরে যাচ্ছিল...'

ফের বিপদতারণ শ্রীমধুসূদন, অর্থাৎ স্যান্ডিকুমারের খকখক কাশি। পিসি এ কাশির অর্থ খুবই ভালো বোঝেন। এর মানে হচ্ছে, 'গল্পের গাড়ি বেলাইন হচ্ছে পিসি, প্লিজ লাইনে ফিরে এসো।' এবার আর পিসি রাগ করলেন না। একটা পানের খিলি সলজ্জভাবে মুখে পুরে বললেন, 'সরি রে, আসলে একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলুম।

সে যাই হোক। সে রাত্রে রেংতার বানানো দুর্দান্ত ডিমের কারি আর আলুভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ার পর কখন যে দু'চোখের পাতা ভারী হয়ে ঘুম নেমে এল তা বুঝতেই পারলাম না!

আসল কাহিনি শুরু হল পরেরদিন থেকে।'

স্তব্ধ নিথর রাত। অযোধ্যাপাহাড়ের কোলে, একটি বড় পাথরের নীচে, কাঠকুটো দিয়ে জ্বালানো আগুন ঘিরে বসেছিলেন চারজন মানুষ। একজন পুরুষ আর তিনজন মহিলা।

চারজনের কেউই কোনও কথা বলছিলেন না। আকাশ ঢেকে আছে ঘনঘোর মেঘে। কাঠকুটো পোড়ার শব্দ ছাড়া বিশ্বচরাচরে আর কোনও শব্দ নেই।

জোর বইছে জোলো বাতাস। সেই বাতাসে শীত করার কথা। কিন্তু চারজনেই বসেছিলেন স্থির চিত্রটির মতো, যেন প্রকৃতির এই তাণ্ডবে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। পুরুষটির বয়েস চল্লিশের আশেপাশে, গায়ে কাপড় বলতে একটি ময়লা খেটো ধুতি, ল্যাঙটের মতো করে পরা। মহিলা তিনজনের পরণে কালোপাড় সাদা শাড়ি। সেই শতচ্ছিন্ন, ময়লা, কাদা রঙের শাড়ি দেখলেই বোঝা যায় যে দারিদ্র্যের কোন নিঃসীম অতল গহ্বরে এদের বাস। সবারই চোখে বাসা বেঁধে আছে বর্তমানের বিভীষিকা আর অজানা ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ।

'সিদু আর কানুর হলটা কী?' দেশীয় ভাষায় প্রশ্ন করলেন একজন মহিলা, 'তাদের খবর কী?'

'কম্পানির সেপাইরা ধরে নিয়ে গেছে তাদের। গত পরশু দুপুরবেলা', দেশীয় ভাষাতেই স্তিমিত স্বরে উত্তর দিলেন পুরুষটি, 'উপরবান্দা গ্রামের জগমাঝি টুরিয়াচাঁদ কিস্কুর বাড়ি থেকে। দুপুরে খেতে বসেছে, এমন সময় হঠাৎ দেখে সেপাইরা ঘিরে ফেলেছে ওদের।'

'তারপর'? তিন বৃদ্ধাই উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন।

'লড়েছিল বটে দুইজনে, বাঘের বাচ্চা', সেই স্তিমিত স্বরের মধ্যেও ঝলসে ওঠে ক্রোধ, 'কুড়াল দিয়ে দিয়েছিল পাঁচ পাঁচটা সা'জোয়ান সেপাইয়ের মুণ্ডু উড়িয়ে। আমার দুই বেটাও ছিল ওদের সঙ্গে, রূপাই আর লখাই। তারাও লড়েছিলো খুব। মরদ হয়েছে আমার ছেলেগুলো রে ডানবুড়িরা, খুব মরদ হয়েছে।' বলতে বলতে চোখের জলে ভেসে যায় মানুষটি রুখাশুখা বুক।

'তারপর?'

'কেটে ফেলেছে ওদের। গলা কেটে ভাসিয়ে দিয়েছে কাঁসাইয়ের জলে। দেহগুলো ফেলে গেছিল গ্রামের জাহের থানে। সিদো, কানু, আর আমার লখাই।' সন্তানহারা বাপের চোখে উপচে পড়ে ভরা বর্ষার যোজন জলধারা।

'আর রূপাই?' প্রশ্ন করেন একজন বৃদ্ধা।

'কাঁসাই নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলো বেটা আমার। ভরা বর্ষার কাঁসাই, সেও বোধহয় আর বেঁচে নেই।' চোখ মুছতে মুছতে বলেন সেই মানুষটি।

'কী করে হয়?' হিসহিসিয়ে ওঠেন আরেক মহিলা, 'সারা মানভূম আর ধলভূমের মাটি যাদের আগলে রেখেছে মায়ের মতো, অযোধ্যা পাহাড়ের সবক'টা গাছের পাতায় লেখা যাদের নাম, যাদের এক চোখে বাস করে পিলচু হড়াম আর চোখে পিলচি বুড়হি, তাদের ধরে নিয়ে যায় কোন শয়তান? কী করে?'

'আমাদের সমাজের কেউ নয় রে ডানবুড়ি। আমাদের সমাজের হলে কেটে রেখে আসতাম না সেই কুকুরটাকে? ওদের ধরিয়ে দিয়েছে একটা দিকু, বাঙালি দিকু।

'নাম বল রে বেদিয়া, কে করেছে এই কাজ? কার জন্যে সিঙবোঙার অভিশাপ নেমে এল আমাদের সোনার বাছাদের মাথায়? গুণ করবো তাকে, মুখে রক্ত উঠে মরবে সে, এই বলে দিলাম রে বেদিয়া। মারাংবুরুর বুক খুঁড়ে আমরা এই তিন ডাইনি বোন তুলে এনেছি কালিয়া মাসানের বিষ। এ দিগরে না আছে আমাদের কোনও আটকান, না আছে কোনও বাঁধন। বল রে বেদিয়া, কে করেছে এই কাজ। তার বুকে ঢেলে দিই কালিয়া মাসানের বিষ। তার সবকিছু জ্বলে ছাই হয়ে যাক।' তৃতীয় মহিলার চোখে ধ্বক করে জ্বলে উঠল রাজগোখরো'র বিষ।

এরপর চুপ করে থাকে সবাই। কাঠকুটোর আগুন বেশ খানিকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে তখন। অল্প আঁচের আভা বিছিয়ে ছিল তাদের সবার চোখেমুখে। সেই অনন্ত মৌনতা ভেঙে মুখ খোলেন পুরুষটি।

'পারাণিক আর গডেতরা লুকিয়েচুরিয়ে খবর এনেছে শহর থেকে। এ কাজ করেছে শাহদেও রাজপরিবারের নায়েব। অনেকে টাকা খেয়েছে রে ডানবুড়ি, অনেক টাকা খেয়েছে লোকটা। তাতেও আশ মেটেনি শয়তানটার। তারপর আমার সিদোকে খেল, কানুকে খেল, লখাইকে খেল...' আর বলতে পারে না লোকটা, কান্নার বেগে গলাটা বন্ধ হয়ে আসে। চুপ করে থাকে বাকিরা।

'তাদের দেহগুলোর কী হল রে? জানিস কিছু?' প্রশ্ন করেন প্রবীণতম বৃদ্ধাটি।

'লুকিয়ে চুরিয়ে ওদের দেহগুলো আমরা নিয়ে গেছিলাম দলমা'র জঙ্গলে। ওদের ওখানেই জ্বালিয়ে দিয়েছি। এই দেখ ডানবুড়ি,' এই বলে গেঁজে থেকে একটা কাপড়ের পুঁটলি বার করেন সেই শোকাহত মানুষটি। 'এই দেখ আমার লখাইপোড়া ছাই। অমন পাহাড়ের মতো মস্ত ছেলেটা আমার এই এত্তটুকু ছাই হয়ে গেল রে বুড়ি। ওরে আমার যে আর কেউ রইল না রে, আমার ঘর রইল না, বাহির রইল না। লখাই রূপাই যে আমার দুটো বুকের পাঁজর ছিল রে, জোয়ান ছেলেদুটো আমার। আমার যে আর কেউ রইল না বুড়ি, কিছু রইল না।' এই বলে বুক চাপড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে মানুষটি।

সমস্ত জঙ্গল যেন শিউরে উঠল সেই কান্না শুনে। মস্ত শালপিয়ালের বন জুড়ে, বিশাল অযোধ্যা পাহাড়ের বুক চিরে, মাথার ওপর অনন্ত আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেন কেউ ঘুরে ঘুরে কাঁদতে লাগল, 'আমার আর কেউ রইল না, কিছু রইল না।' বাতাসে পরতে পরতে ঘুঙুরের আওয়াজের মতো জড়িয়ে গেল সেই কান্না, 'আমার আর কেউ রইল না, কিছু রইল না।' তারার আলোয়, মাটির ওমে, মহুয়ার ফুলে যেন কেউ উজাড় করে দিল তার বুকভাঙ্গা দুঃখের জল, 'আমার আর কেউ রইলো না, কিছু রইল না।'

উঠে দাঁড়ান একজন বৃদ্ধা, হাত বাড়িয়ে পুঁটুলিটা হাতে নেন। পুঁটুলিটার ওপর বিড়বিড় করতে করতে করতে হাত বোলাতে থাকেন। তারপর বাকি দুই সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ওঠ রে ডাইনি বোনেরা আমার। জাগিয়ে তোল মারাংবুরুর রাগ। আয়, এই ছাইয়ে মিশিয়ে দিই কালিয়া মাসানের বিষ। আর শোন রে বেদিয়া, আমরা নেবো তোর চোখের মণি আর বুকপাঁজরের রক্ত। আর এই ছাইতে মিশিয়ে দেবে হাজার কালনাগিনীর গরল। যে করে হোক, এই ছাই তুলে দিস সেই বিশ্বাসঘাতক দিকুর মুখে। যে আমাদের বাছাদের ধরিয়ে দিয়েছে সেপাইদের হাতে, খুন করেছে আমাদের ছেলেদের, দু'দিনের মধ্যে মুখে রক্ত উঠে মরবে সে। মরবে অশেষ কষ্ট পেয়ে। তার বুক জ্বলে যাবে আগুনে, তার চোখ খুবলে খাবে নরকের দেও'রা। সে না পারবে জেগে থাকতে, না পারবে শান্তিতে ঘুমোতে। যত আবগে বোঙ্গা আছে দুনিয়াতে, তাদের ডেকে তোল রে বোনেরা। কালসিং আর গদরবোঙা নেমে আসুক সেই দিকুটার ওপর, সবাই মিলে চুষে খাক ওর রক্ত মাংস আর অস্থি মজ্জা।'

মানুষটা চুপচাপ বসেছিলেন। প্রবল শোকে তাঁর বুকের মধ্যে উথলে উঠেছে কান্নার ঢেউ। তাঁর কাছে এসবই অর্থহীন লাগছিল। নিস্তেজ স্বরে তিনি বলেন, 'সে তো টাকাপয়সা নিয়ে কলকেতা না কোথায় চলে গেছে। তার ঠিকানা কেউ জানে না। তার কাছে পৌঁছব কী করে?'

তারপর সেই তিন ডাইনিবুড়ি আরও ঘন হয়ে আসে, 'পাবি রে বেদিয়া, তাকে পাবি। যতদিন না পাস, ততদিনে তুই খুঁজে বেড়াবি সেই শয়তানটাকে। শোনরে ছেলে, তোকেও জাদুটোনা করব আমরা। এই রক্তবিষের কাটান হতে পারে শুধু তোর নিজের রক্ত। তাই তোর এই রক্তমাংসের দেহ নিয়ে নেব আমরা, যাতে করে এই বিষের কোনও জবাব না থাকে। তার বদলে তোকে আমরা দেব ছাইয়ের দেহ, ছাইয়ের জীবন। খুঁজে বেড়াবি সেই দিকুকে, জনমভোর। সে না হোক তার ছেলে, তার ছেলে না হোক তারও ছেলে...কাউকে না কাউকে একদিন তুই খুঁজে পাবিই রে বেদিয়া। ততদিন তুই মরবি না, তোর ছাইয়ের দেহ থাকবে এমনই সুঠাম, এমনই সবল। ওই বিশ্বাসঘাতকের বংশের কারও না কারও বুকে এই কালিয়া মাসানের ছোবল না বসালে তোর মুক্তি নেই রে বেদিয়া, তোর মরণ নেই।'

এই বৃষ্টিভেজা অরণ্যরাত্রিতে, এই নিভন্ত আগুনের আঁচে, এই তিন ডাইনিবুড়ির কথায় সব গোলমাল হয়ে গেল মানুষটার। কার পাপে কার শাস্তি হয়? মানুষের পাপের ফল তার সন্তানদের ওপর অর্শায় কীসে? কতদিন থাকে পাপ আর পুণ্যের উত্তরাধিকার? কাকেই বা বলে পাপ, কাকেই বা বলে পুণ্য? কোনটা ন্যায় আর কোনটাই বা অন্যায়? ভালোই বা কী আর মন্দই বা কী? এসব বোধের থেকে অনেক দূরে চলে গেছিলেন তিনি, তাঁর চৈতন্য আর কাজ করছিল না তখন। ভূতগ্রস্তের মতো উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'তাই কর রে ডানবুড়িরা। বুকে বড় জ্বালা রে আমার, বড় জ্বালা। হা রে আমার লখাই..হা রে আমার রূপাই...' দু'হাত আকাশের দিকে তুলে আবার হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন তিনি।

'পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠে দেখি মহুয়া আগেই উঠে পড়েছে। আমার বিছানার উল্টোদিকের দেওয়ালেই একটা বিশাল জানলা ছিল। মহুয়া দেখি সেই জানলার সামনে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে, নাকমুখ গ্রিলে ঠেকিয়ে রেখেছে। আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, কী রে মৌ, কখন উঠলি ঘুম থেকে? জবাবে মহুয়া আমার দিকে ফিরে একটা ঘর আলো করা স্মাইল দিয়ে জানলাটা ছেড়ে দাঁড়াল। আর আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম প্রায়!

অযোধ্যা পাহাড়টা যে এত কাছে সেটা কাল বুঝিনি। গত রাতে বোধহয় একচোট বৃষ্টি হয়ে গেছে, শীতের বাতাসে একটা ঠান্ডা ফ্রেশ ফ্রেশ ভাব। আর নীল ঝকঝকে আকাশ জুড়ে কালচে সবুজ আর গেরুয়া রং মেখে দাঁড়িয়ে আছে অযোধ্যা পাহাড়। হেমন্তের শেষে হলুদ পাতায় সাজানো সেই পাহাড়ি বন কী মায়াঘোরই না বিছিয়ে রেখেছে। আকাশে উড়ছে নাম না জানা পাখিদের দল। আমাদের বাংলোর বারান্দার পরেই সাজানো বাগান, আর এই পুরো বাংলো ঘিরে আছে শক্ত শালবল্লার বেড়া। বেড়ার ওপার থেকেই শুরু মেঠো জঙ্গুলে পথ, ঝরাপাতা বেছানো সেই পথ ধীরে ধীরে মিশেছে ঘন বনের মধ্যে। সব মিলিয়ে পুরো দৃশ্যটা ঠিক যেন আমাদের ছোটবেলার আর্চিসের গ্রীটিংস কার্ডে আঁকা ছবি একখানা।

আমি উঠে এসে ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই আরেক চমক! বারান্দা থেকে একদম সামনেই অযোধ্যা পাহাড়, আর বারান্দার একদম ডানকোণে গিয়ে ঘাড় ঘোরালেই দূরে দেখা যাচ্ছে দলমা পাহাড়ের রেঞ্জ! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, বুঝলি! ভাষায় বোঝাতে পারবো না। বাংলোর বাইরেটায় মনে হচ্ছে কে যেন সবজে হলদে কার্পেট পেতে দিয়েছে, আর তার ওপর টুপটাপ করে এসে পড়ছে বড় বড় শালপাতা। ঝলকে ঝলকে মনমাতানো ঠান্ডা বাতাস আর তার সঙ্গে মেশানো একটা বুনো গন্ধ আমাদের নাকে এসে লাগতেই মনে হল আহ, মাত্র তিনদিন কেন? আরও কয়েকদিন থেকে যাই না কেন এখানে?

রেংতার হাতে বানানো দুর্দান্ত ভালো রুটি সবজি আর ডিমসিদ্ধ খেয়ে আমরা তিনজনে যখন তৈরি তখনই বাইরে টেম্পোর হর্ণ। দেখি বুধনদা'র দেখে দেওয়া আরেক গাড়িওয়ালা মংলা'দা তার টেম্পো নিয়ে এসে হাজির। দেখে আমাদের তো খুশি আর ধরে না। একটা বেতের বাস্কেটে রেংতার বানানো লাঞ্চ নিয়ে রওনা হতে আমাদের লাগল ঠিক দশ মিনিট। তারপর টেম্পো চলল অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে।

রাস্তার সিনিক বিউটির বর্ণনা দিয়ে আর তোদের হিংসে বাড়াব না। শুধু একবার বলব যে প্রথম যখন স্কটিশ হাইল্যান্ড দেখি, তখনও ঠিক এইরকমই অনুভূতি হয়েছিল। এই শীতে তোরা বন্ধুরা মিলে ঘুরে আয় না একবার। এখন অবশ্য রাজ্যের ট্যুরিস্টরা গিয়ে তার কী হাল করেছে বলতে পারব না।

সে যাই হোক, লোয়ার ড্যাম আপার ড্যাম পেরিয়ে যখন বামনী ফলস পৌঁছই তখনই বেশ দেরি হয়ে গেছিল। সকালের হেবি ব্রেকফাস্ট তখন পেটের মধ্যে কোথায় যে তলিয়ে গেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। রাস্তা থেকে প্রায় তিনশো মিটার নীচে নামলে বামনী ফলস। তরতর করে পাথুরে পথ সামলে নেমে তো গেলুম, তারপর সেখানে ঘণ্টাখানেক কাটাবার পর উঠে আসতে সে যে কী কষ্ট তা আর কী বলব!

তারপর গেলুম তুর্গা ড্যাম। সেখানে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখে তো আমরা মোহিত। দীপাঞ্জন তো হাতফাত নেড়ে হেঁড়ে গলায় "ভারত আমার ভারতবর্ষ" ইত্যাদি গেয়েটেয়ে একশা! আমরা সেখানেই রেংতার বানানো অসম্ভব ভালো ঝাল ঝাল চিকেন কারি, রুটি আর জিলিপি দিয়ে লাঞ্চ সেরে নিলাম।

নীচে নেমে এসে এসে মংলা'কে এরপর কোথায় যাব জিগ্যেস করাতে যখন শুনলাম যে, এরপর আমাদের গন্তব্য দুয়াসিনির হাট, তখন সারাদিনের ক্লান্তি সত্ত্বেও আমি আর মহুয়া ভারি আহ্লাদে নেচে উঠলাম। এই এলাকার গ্রামের হাট মানেই লাক্ষার তৈরি দারুণ দারুণ সব ভালো জাঙ্ক জ্যুয়েলারি তো আছেই, তাছাড়া সাঁওতালদের তৈরি খুব ভালো ভালো হ্যান্ডিক্রাফটস পাওয়া যায়। কাছেই চড়িদা গ্রাম, ছৌ নাচের মুখোশ তৈরি করার জন্যে সারা পৃথিবীবিখ্যাত। আমরা দুই সখি তো শুনেই খুব চনমনে, দীপাঞ্জন মিনমিন করে 'আজ খুব রাত হয়ে যাবে' ইত্যাদি টাইপের অজুহাত দিলেও বিন্দুমাত্র পাত্তা দিইনি। মংলাদা'কে বললাম চল দুয়াসিনি।

সেই দুয়াসিনির হাটেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, যেখান থেকে আমাদের কাহিনি শুরু।

আমরা তিনজনে হাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর পাঁচটা আদিবাসী হাট যেমন হয় এটাও সেরকমই। মাটিতে প্লাস্টিকের তেরপল বিছিয়ে লোক্যাল আর্টিফ্যাক্টসের জিনিস আর তার সঙ্গে কাঁচা তরিতরকারি, স্থানীয় খাবারদাবার, ইত্যাদির দোকান। হাটের পেছনদিকটায় হাঁড়িয়া আর মহুয়ার ঠেক, তার উগ্রগন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে।

মহুয়া আবার জাঙ্ক জুয়েলারির নামে পাগল, তাকে দেখে সেই ড্যাঞ্চিবাবুদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আর কী। আমাদের কেনাকাটা শেষ হওয়ার পরেও ওকে দেখে মনে হচ্ছে তার মার্কেটিং-এর আশ এখনও মেটেনি, পারলে এই দুয়াসিনির হাটের একটা অংশ সে কলকাতাতেই নিয়ে যায়!

মহুয়াকে জোরজার করে টেনে আমরা বেরিয়ে আসব, এমন সময় দেখি বেরোনোর রাস্তার মুখেই ছোট্ট একটা ঘুগনির ডালা নিয়ে একটা ঘুগনিওয়ালা বসে আছে।

এখানে বলে রাখি যে, আমাদের কলেজের 'ঘুগনি ও ফুচকাপ্রেমী সমিতি'-র প্রেসিডেন্ট ছিল মহুয়া। যে কোনও জায়গায়, যে কোনও পরিস্থিতিতে দু'প্লেট ঘুগনি বা খান বিশেক ফুচকা উড়িয়ে দেওয়া ওর কাছে কোনও ব্যাপারই ছিল না। সে তো হাসিমুখে গিয়ে দাদা, দু'প্লেট ঘুগনি দাও তো! বলে স্ট্রেট দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমার কেন জানি খেতে ইচ্ছে হল না। তোরা তো জানিস, হাইজিনের ব্যাপারে আমি একটু বেশি পিটপিটে। যেখানে সেখানে ইয়ে ইয়ে হাতে বানানো খাবার খাওয়া আমার পোষায় না।

দীপাঞ্জনও 'এখন খেলে আর খেতে পারব না।' বলে দাঁড়িয়ে রইল। মহুয়া অবশ্য যেভাবে বুভুক্ষুর মতো দাঁড়িয়ে ছিল তাতে মনে হওয়া খুবই সম্ভব যে মেয়েটা এখুনি আফ্রিকার কোনও দুর্ভিক্ষপীড়িত জায়গা থেকে এসেছে, আর ওর সামনে এখন একহাঁড়ি বিরিয়ানি।

আমার কেমন জানি একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। তোরা তো জানিস, আমার সিক্সথ সেন্স জিনিসটা খুবই প্রবল। শুধুই মনে হচ্ছিল কিছু একটা যেন ঠিক হচ্ছে না। কী যেন একটা মস্ত ভুল হতে চলেছে। অথচ তার কারণটা কিছুতেই ধরতে পারছি না। এমন সময় চোখ গেল ঘুগনিওয়ালার দিকে। আর অস্বস্তিটা চতুর্গুণ বেড়ে গেল।

অথচ লোকটাকে দেখে এমন আলাদা কিছু লাগার কথাই নয়। এই এলাকার গরিব মানুষজন যেমন হয় তেমনই। রোগাসোগা শরীর, সারা গায়ে একটা ময়লা চাদর জড়ানো, সেটাই মাথা থেকে কপাল অবধি ঢেকে রেখেছে। লোকটার চোখ নামানোই ছিল, মহুয়ার কথা শুনে শিরাওঠা হাতে বাঁ-হাতে একটা শালপাতার ডোঙা নিয়ে, ডানহাতে ধরা বড় চামচ দিয়ে ডালার ওপরে রাখা মস্ত অ্যালুমিনিয়ামের থালা থেকে ঘুগনি নিয়ে বেড়ে দিয়ে লাগল। কোনও কারণ ছিল না, তবুও আমি বেশ মন দিয়ে লোকটা লক্ষ্য করতে লাগলাম।

আমি মহুয়ার থেকে একটু কোনাকুনি দাঁড়িয়েছিলাম, লোকটার মুখের বাঁদিক আর বাঁদিকের চাদরটা সরে গিয়ে সেদিকের কাঁধটা আমার চোখের সামনে দেখা যাচ্ছিল। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল যে এই কাঁধটা আমি দেখেছি, এবং শুধু তাই নয়, খুব সম্প্রতি দেখেছি। কিন্তু কোথায় দেখেছি সেটা কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না।

লোকটা ঘুগনিটা দিল, চামচটা রাখল থালার কিনার ঘেঁষে। তারপর ডালার একটু নীচ থেকে একটা ময়লা পুঁটুলি বার করল। আমি তখনও দেখে যাচ্ছি। পুঁটুলি মধ্যে থেকে কী একটা বার করে, খুব সম্ভবত বিটনুন হবে, ঘুগনির ওপর ছড়িয়ে দিল। তারপর একটা শালপাতার টুকরো চামচ হিসেবে ঘুগনিটার মধ্যে গুঁজে দিয়ে সেটা বাড়িয়ে দিল মহুয়ার দিকে।

পুঁটুলিটা দেখেই আমার ঘেন্না লাগছিল খুব। কিন্তু মহুয়াকে এসব বলে খুব একটা লাভ নেই। সে ততক্ষণে একসঙ্গে অনেকটা ঘুগনি মুখে তুলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে চিবোতে চিবোতে আমাকে বলল, কীরে দীপু, একচামচ খাবি নাকি? আমি যথারীতি ঘাড় নেড়ে না বলে ব্যাগ থেকে দু'টাকা বার করে লোকটার সামনে এসে তার হাতে দিতে গিয়ে দেখি লোকটা এইবার চোখ তুলে তাকিয়েছে, আর সটান তাকিয়ে আছে মহুয়ার দিকেই।

সেই দৃষ্টি দেখে আমার বুকের ভেতরটা একবার ধ্বক করে উঠল, জানিস! সেই চোখ দুটোর কোণায় এমন একটা শয়তানি হাসি যেটা দেখলে অতি বড় সাহসীরও বুক কেঁপে উঠতে বাধ্য। আমি চট করে টাকা দুটো প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে মহুয়ার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসছি, এমন সময় সেই বিটনুনের

পুঁটুলিটা থেকে খানিকটা বিটনুন উড়ে এসে আমার হাতে এসে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে সেই নুনটা ঝেড়ে ফেলতে যাচ্ছি, দেখি নুনের দানাগুলো আমার হাতে লেপ্টে গেল।

আর তখনই বুঝলাম যে এটা নুন নয়।

এটা ছাই।

এই ছাই কয়েকদিন আগেই আমরা দেখেছি একবার।

কলেজ স্ট্রিট থেকে শেয়ালদা যাওয়ার সময় যে লোকটার টানা রিকশায় গেছিলাম, তার গা থেকে এইরকম ছাই উড়ে আসছিল।

তার চোখটাও এরকম ছিল, তার কাঁধটাও এরকম। তাই আমার অত চেনা চেনা লাগছিল।

এই লোকটা সেই লোকটা।

বিদ্যুৎচমকের মতো কথাগুলো একের পর এক মাথার মধ্যে গেঁথে যেতেই আমার গা'টা ভয়ে শিরশির করে উঠল। আর ঠিক সেই সময়ে হু-হু করে হাড়ে কাঁপুনি ধরানো একটা প্রবল হাওয়ার স্রোত যেন কোথা থেকে ছুটে এসে আমাদের ঘিরে ধরে নাচতে লাগল, আর কে যেন হা হা করে হেসে উঠে বলল, 'কালিয়া মাসান, কালিয়া মাসান।'

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে জায়গাটা খালি, যেন কেউ ওখানে কখনও ছিলই না।

মহুয়া আর দীপাঞ্জনকে নিয়ে আমি ছুট লাগালাম মংলাদা'র টেম্পোর দিকে। ঝটপট করে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'বাংলোয় চলো মংলাদা। এক্ষুনি।'

আর সেই রাতেই জ্বর এল মহুয়ার। বেহুঁশ করে দেওয়া প্রবল জ্বর।'

এতক্ষণ কথা বলে দীপুপিসির গলা শুকিয়ে গেছিল। স্যান্ডির দিকে তাকাতেই স্যান্ডি একটা পান আর জলের বোতল পিসির দিকে এগিয়ে দিল, আর ওর দিকে তাকিয়ে একটা মধুর স্নেহের হাসি উপহার দিয়ে পিসি ফের শুরু করলেন।

'সেই রাতটার কথা আমার খুব মনে থাকবে রে। অমন বিপদে জীবনে কখনও পড়িনি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আর যেন কোনওদিন পড়তেও না হয়।

টেম্পোতে বসেই কেমন যেন চুপ করে গেছিল মহুয়া, কোনও কথা বলছিল না। দীপাঞ্জনও একটু ঘাবড়ে গেছিল। আমি গাড়িতে যেতে যেতে একবার ঠেলা দিলাম মহুয়াকে, বললাম কী রে মৌ, চুপ করে গেলি যে। কিছু বলল না মেয়েটা, শুধু একবার অদ্ভুতচোখে আমার দিকে তাকাল।

খেয়াল করলাম চোখটা লাল হয়ে আছে একটু।

বাংলোতে পৌঁছে মংলাদাকে ছেড়ে দিলাম। বললাম পরেরদিন সকালে আসতে, ইচ্ছা ছিল পরের দিন জঙ্গলের একটু ভেতরের দিকে যাব। মংলাদা টেম্পো ঘুরিয়ে চলে যেতেই অন্ধকারটা ঘিরে ধরল আমাদের। মেন গেট থেকে বারান্দা অবধি মোরাম বিছানো রাস্তা, আমরা হেঁটে হেঁটে গেট যাচ্ছি, এমন সময় মহুয়া হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা তো অবাক, জিগ্যেস করলাম, কী রে, কী হল?

একটু অস্বাভাবিক গলায় মহুয়া সামনের দিকে আঙুল তুলে একবার শুধু বলল 'লোকটা।'

আমরা তো সামনে বা আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না। আগেই বলেছি, ছোটবেলা থেকেই আমার আইসাইট খুব শার্প, আমার দেখার ভুল হতেই পারে না। তাছাড়া, দীপাঞ্জনও কিছু খুঁজে পেল না। আমি একটা কড়া করে ধমকই দিলাম মহুয়াকে, কোথায় কে? ভুল দেখছিস নাকি? খানিকক্ষণ চুপ থেকে মহুয়া সেই একই গলায় শুধু একবার বলল, হুঁ।

ঘরে ঢুকে বাথরুমে গেলাম ফ্রেশ হতে। ঢোকার সময়ে দেখি মহুয়া সটান শুয়ে পড়েছে ওর বিছানায়, ডানহাতটা উলটো করে কপালে দিয়ে। সারাদিন অনেক ধকল গেছিল, ফলে স্নানটান করে বাথরুম থেকে

বেরোতে আমার দেরিই হল খানিকটা। বেরিয়ে দেখি তখনও মেয়েটা বিছানায় ওভাবেই শুয়ে আছে। আমার একটু সন্দেহ হল, জিগ্যেস করলাম, কী রে মৌ, স্নান করতে যাবি না?

বিন্দুমাত্র না নড়েচড়ে সেই অদ্ভুত গলায় উত্তর দিল মহুয়া, না রে, শরীরটা ভালো লাগছে না।

কাছে গিয়ে ডানহাতের চেটোর উল্টোপিঠটা ওর কপালে রাখলাম। হুঁ যা ভেবেছি তাই, গা'টা বেশ গরম হয়েছে। হতেই পারে, বাড়ির আদুরে মেয়ে, আমার মতো গেছো নাকি, যে সারাদিনের এত পরিশ্রম সইবে?

চোখ বুজে রেখেছিল মহুয়া। জোর করে মাথা থেকে ওর হাত সরিয়ে ডান চোখের নীচের পাতাটা টেনে ধরলাম, আর মোমবাতির অল্প আলোয় ওর চোখদুটো দেখে বেশ খানিকটা চমকে গেলাম। দুটো চোখই বেশ লাল হয়ে আছে!

কী রে, হল টা কী তোর? উদ্বিগ্নস্বরে জিগ্যেস করলাম আমি।

শরীরটা ভালো না রে, সেই অস্বাভাবিক গলায় স্তিমিত ভাবে বলল মহুয়া।

বেশ চিন্তায় পড়া গেল তো, বিদেশেবিভুঁইয়ে এ কী গেরো রে বাবা! সেকালে ওই অঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা আজকালকার মতো এতো ভালো ছিল না, চাইলেই চট করে হাসপাতাল নার্সিংহোম অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি পাওয়া ছিল ভারি মুশকিল। তার ওপর জায়গাটা পুরুলিয়ার একপ্রান্তে অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে, তখনকার দিনের নিরিখে শহুরে সুযোগ সুবিধার বাইরের এলাকা। এখানে কেউ সেরকম অসুস্থ হয়ে পড়া মানে দুর্ঘটের একশেষ।

আমার কাছে ছোটখাটো একটা ফার্স্ট এইড বক্স সবসময় থাকতোই। সেখান থেকে একটা ক্যালপল বার করে রাখলাম ওকে খাওয়াব বলে। মুশকিল হচ্ছে যে খালিপেটে ওষুধটা খাওয়ানো যাবে না। তাই বাইরে বেরিয়ে রেংতার উদ্দেশ্যে একটা হাঁক পাড়লাম, বললাম তাড়াতাড়ি খাবার বেড়ে দিতে। রেংতাও চটপটে লোক, আধঘণ্টার মধ্যে খাবার সার্ভ করে দিল। এই এতক্ষণ ধরে কিন্তু মহুয়া কিচ্ছুটি বলেনি, সেই যেরকম ছিল, সেইরকমভাবে মাথায় হাত দিয়ে শুয়ে রইল।

সেই রাতে মহুয়া খেয়েওছিল খুব অল্প। আমরা ভাবলাম বুঝি সন্ধেবেলা অতটা ঘুগনি খেয়েছে বলে ক্ষিদে নেই। সে যাই হোক, রেংতার বানানো ঝালঝাল ডিমের ঝোল আর ভাত খেয়ে যখন আঁচিয়ে উঠলাম, তখনই বাজে প্রায় রাত দশটা। সেরাতে শীত পড়েছিল জব্বর, দিব্যি ঠান্ডা ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল। আমরা খেয়ে দেয়ে চাদর টাদর জড়িয়ে বাংলোর সামনের বারান্দায় বসে আড্ডা দিচ্ছি। তার একটু পরেই একটা ঘটনা ঘটে যা ওই শীতের রাতেও আমাদের ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল।'

এতটা বলে পিসি আমাদের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে নিল একবার। দেখি পিসির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

'আমরা বসে বসে গল্প করছি, মানে আমি, মহুয়া, দীপাঞ্জন আর রেংতা। কথা অবশ্য আমরা তিনজনেই বলছি, মহুয়া চুপ করে বসে ঝিমোচ্ছে। একটা ক্যালপল খাইয়ে দিয়েছি ওকে, আজকের রাতটার মতো নিশ্চিন্দি। দীপাঞ্জনকে বলে রেখেছি যে পরেরদিন সকালে মংলাদা এলে বরাভূম স্টেশনের বাজারে গিয়ে থার্মোমিটার কিনে আনতে। বেশি বাড়াবাড়ি হলে সোজা কলকাতা নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কী? এ এলাকায় ডাক্তার পাওয়া আর ভগবান পাওয়া প্রায় একই ব্যাপার।

জানি না আগে বলেছি কি না, বারান্দায় এক কোনায় একটা দোলনা ছিল। শালকাঠের তৈরি মজবুত জিনিস, মোটা দড়ি দিয়ে বারান্দার সিলিঙে বাঁধা। দোলনাটা বারান্দার যেদিকে ছিল, তার উল্টোদিকে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম আমরা। আলোটালো সব নিভিয়ে দিতে বলেছি, ফলে সামনের দিকটায় চমৎকার একটা সিনারি তৈরি হয়েছে। আকাশে একটুখানি বাঁকা চাঁদ। তার অল্প আলোয়, আবছায়া আর অন্ধকারে বাংলোর সামনেটা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে বুনো ফুলের সুবাস ভেসে আসছে, আর ভেসে আসছে

রাতের জঙ্গলের শব্দ। এদিকে বাতাসে শীতের কামড় ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। আমাদের প্রত্যেকের গায়ে মোটা চাদর, আমি আর দীপাঞ্জন প্রায় গুটিসুটি মেরে বসে আছি, বেশ একটা ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশ। রেংতা ওদের গ্রামের কথা বলছিল, ওর ছেলেবেলার গল্প শোনাচ্ছিল আমাদের। আমরা বুঁদ হয়ে সেসব শুনছিলাম, মহুয়া একদিকে চুপচাপ বসেছিল।

ওদের গ্রামের নিশিতে পাওয়া লোক, ডাইনি ইত্যাদি নিয়ে নানারকম ভয়ধরানো গল্প বলছিল রেংতা। কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে একবার চুপ করে গেল ও, ঘাড় ঘুরিয়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে বাইরের মেন গেটের দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা একটু অবাকই হলাম, আমি বললাম, কী হল গো রেংতা, চুপ করে গেলে যে?

রেংতা সামান্য ভয় পাওয়া গলায় বলল, উট্যা কে বট্যে?

দীপাঞ্জন বিস্মিত গলায় বলল, 'কে? কার কথা বলছ?

দরজা খুইল্যে ঢুকল কে? একবার দেখলাম মনে হইল, আর দেখতে পেলমনি!

এবার উঠতেই হয়। রাতবিরেতে বাংলোতে দরজা খুলে চোর ডাকাত ঢুকলে সেটা মোটে ভালো কথা নয়। আমরা, মানে আমি আর দীপাঞ্জন ওই আলো আঁধারিতেই বাংলোর চারিপাশ বেশ খানিকক্ষণ ধরে খুঁজলাম, কিন্তু কোথায় কে? কই কোথাও কেউ নেই তো!

চারিধার দেখেটেখে চাদরমুড়ি দিয়ে বসেছি, রেংতা ফের ওর গল্প শুরু করতে যাবে, এমন সময় দেখি গায়ের চাদর খুলে সোজা হয়ে উঠে বসেছে মহুয়া, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে ওর, ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে আঙুল তুলে বলে উঠল, ওই যে, লোকটা!

ওর আঙুল সোজা সেই দোলনাটার দিকে তোলা।

এবার আমরা বাকি তিনজনেও ওদিকে ঘাড় ঘোরালাম।

দেখলাম ওই আলোআঁধারিতে দোলনাটা অল্প অল্প দুলছে, আর তাতে বসে আছে অন্ধকার রঙের একটা লোক!

কতক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিলাম জানি না, হাতেপায়ে কোনও সাড় ছিল না। আমার মনে হচ্ছিলো আশেপাশে যেন আর কোনও শব্দ নেই, কোনও আলো নেই, এই বিশ্বচরাচরে আর কোথাও কিচ্ছুটি নেই। হাওয়া থেমে গেছে, দোলনার সেই ক্যাঁচকোঁচ শব্দ ছাড়া চারিদিকে বধির করে দেওয়ার মতো স্তব্ধতা। একটা মেঘ এসে চাঁদটাকে একবার ঢেকে দিয়ে ফের সরে যেতেই স্পষ্ট দেখলাম যে, সেই লোকটার অবয়ব যেন আস্তে আস্তে জমাট বেঁধে আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আর যেন কতকাল ধরেই সে মানুষটা দোলনায় দুলছে, দুলেই চলেছে। আধো অন্ধকারেও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার রোগা শরীরটা।

সেই বধির স্তব্ধতা ছাড়িয়ে, সব ছাপিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠছে ওর বুকের বাঁদিকে সেই কাটা দাগটা!

আর বুকে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে সেই আগুনে চোখ দুটো। অন্ধকারের লোকটা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

ভুল হলো, আমাদের দিকে নয়, সে তাকিয়ে আছে শুধু মহুয়ার দিকে।

এই প্রথম ভয় পেলাম আমরা, তীব্র ভয়। মহুয়া ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, আমারও হাত-পা সরছে না ভয়ে। রেংতা কী করছে দেখতে পাচ্ছি না, শুধু শুনতে পাচ্ছি দুর্বোধ্য সাঁওতালি ভাষায় কীসব বলে চলেছে সে। একেকটা মুহূর্ত মনে হচ্ছে যেন এক এক যুগ। লোকটা কিছু বলছে না, কিছু করছেও না। শুধু সেই শয়তানি হাসিটা সারা মুখে মেখে গনগনে কয়লার মতো লাল চোখ মেলে এই দিকে তাকিয়ে আছে।

এমন সময় উঠে দাঁড়াল দীপাঞ্জন, সজোরে চেঁচিয়ে উঠল, কে তুই? এখানে এলি কী করে? তোর সাহস তো কম নয়। যা, যা বলছি এখান থেকে! বলে ছেড়ে রাখা চপ্পলের একটা পাটি তুলে ধরল ছুঁড়ে মারবে বলে।

আর তারপরেই ঘটল ম্যাজিক। হঠাৎ যেন লোকটার সারা দেহ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়ে সেই আধো আঁধারির মধ্যে মিশে গেল। ঘটনাটা এত চকিতে ঘটল, যে আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব কিছু ফের

আগের মতো! যেন একটু আগে কিছুই ঘটেনি এখানে!

মহুয়ার দিকে তাকিয়ে দেখি দেওয়ালের গায়ে ঢলে পড়েছে ও। দৌড়ে গিয়ে তুলতে যাব, গায়ে হাত ঠেকাতেই দেখি তীব্র জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ওর গা।

আর ওর সারা দেহ জুড়ে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ!

আমাদের প্ল্যান ছিল পরের দিনই যেভাবে হোক মহুয়াকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার। এখানে থাকলে এই জ্বর বেড়ে বেড়ে ও যে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে সেটা অনুমান করতে জ্যোতিষী হতে হয় না। আমি আর দীপাঞ্জন চাইছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ভূতুড়ে জায়গা ছেড়ে কলকাতা ফিরে যেতে।

কিন্তু সে প্ল্যানে বাধ সাধলেন প্রকৃতি স্বয়ং!

সেইদিন মধ্যরাত থেকে নামল আকাশপাতাল ভাসানো মুষলধার বৃষ্টি। বাপ রে, এত বছর বয়েস হয়ে গেল, সেই রাতের ঘোর বৃষ্টির কথা ভুলব না। মনে হচ্ছিল পুরো অযোধ্যা পাহাড়টা যেন গলে গলে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। সেইসঙ্গে ঠা-ঠা করে পড়ছে বাজ আর বাইরে বইছে প্রবল ঝোড়ো হাওয়া। মাঝরাতে উঠে একবার জানালাটা খুলেছিলুম, দেখলাম যে বারান্দার ওপারে কে যেন একটা মোটা পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছে, এমনই অবিশ্রান্ত সেই জলধারা। মনে হচ্ছিল বাংলোর ছাদে কেউ যেন পুরো পাঞ্চেৎ ড্যামটাই খুলে উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে। নেহাত ব্রিটিশ আমলে বানানো বাংলো, নইলে সেইরাতে আমাদের ভেসে যাওয়াও কিছু বিচিত্র ছিল না।

তবে বৃষ্টি নয়, আমাকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল মহুয়ার শারীরিক অবস্থা। প্রচণ্ড জ্বর আর অসম্ভব পেট ব্যাথায় মেয়েটা তখন কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে। মাঝরাতে উঠে আরেকবার ক্যালপল দিয়েছি। তাতে সাময়িকভাবে জ্বর কমলেও পেট ব্যথার কোনও সুরাহা হওয়ার চিহ্নমাত্র নেই। ঘুমোতেও পারছে না মেয়েটা। খানিকক্ষণ ঘুমোবার পরেই অস্ফুটে—ওই, ওই এল, ওই এল আমাদের ধরবে বলে রে। ওই এল রে সাদাদের সেপাই.. এইরকম অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছে সে, আর উঠে বসে উদভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক চাইছে। এসব দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে যে টেনশনে এবার আমিই অসুস্থ হয়ে পড়ব। এই অজানা অচেনা জায়গায় কিছু একটা হয়ে গেলে বিশ্বনাথ কাকুর কাছে গিয়ে মুখ দেখাব কী করে? এসব পাগল করে দেওয়া চিন্তায় আমার মাথাটা কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। তার ওপরে সেই বিচ্ছিরি মড়াপচা গন্ধে আমার তখন পেটের ভাত উঠে আসার জোগাড়। দীপাঞ্জনও সেদিন আমাদের ঘরেই ছিল, দিদিকে ছেড়ে একফোঁটাও এদিক-ওদিক নড়েনি ছেলেটা, ঠায় বসেছিল দরজার কাছে।

অনেক কষ্টে শেষরাতে মহুয়াকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করলাম একবার। মাঝখানে একবার ভাবলাম এই ঘুমোল বুঝি। কিন্তু কোথায় কী? বিছানায় কোমরটা একটু ঠেকিয়েছি মাত্র, এমন সময় দেখি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই আর্তস্বরে চিৎকার করছে মেয়েটা, ও কারা এল, কারা এল রে! ওরে কুঠার বার কর, ওরা সাদাদের সেপাই, ওরে কে কোথায় আছিস...দৌড়ে আয় রে মরদের বাচ্চারা...আন টাঙ্গি...মার ওদের..'

গলাটা ওর নিজের নয়! আর ভাষাটাও বাংলা নয়...বাংলা মেশানো মানভূমের ভাষা!

ধড়মড় করে উঠে বসলাম আমি। দেখি দীপাঞ্জনও উঠে বসেছে। আমি ওর বিছানায় গিয়ে সোজা চেপে ধরলাম ওকে, আর আমার দুটো হাত যেন সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে গেল। দেখি তীব্র জ্বরে ওর সারা দেহ পুড়ে যাচ্ছে আগুনের মতো! আর ঠিক তখনই হঠাৎ করে কী যেন হল, মনে হল কেউ যেন একটা বর্শা চালিয়ে দিয়েছে ওর পেট বরাবর। একবার ওঁক করে থরথরি কেঁপে উঠল মেয়েটা, আর তারপরেই চোখের মণিদুটো উলটে গেল, বুঝলি? মানে জাস্ট উলটে গেল! দেহটা ধনুকের মতো বেঁকে আছে, মাথাটা অল্প পেছনে ঝোঁকানো, ড্যাবড্যাব করে খোলা চোখদুটো জুড়ে শুধু চোখের সাদা অংশটা, আর তার ঠিক পরে পরেই অন্য একটা ঘষা পুরুষালি গলায় ক্রুদ্ধস্বরে সাঁওতালি ভাষায় কীসব যেন বলতে শুরু করল মহুয়া!

সেই গলা শুনে আমার শিরদাঁড়া দিয়ে ভয়ের একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। এ কোন মহুয়া? এই এতদিনের চেনা মেয়েটার শরীরে এ কার গলা?

মহুয়া তখন ওর পা দুটো বিছানায় আছড়াচ্ছে কাটা পাঁঠার মতো। সাপের মতো দীর্ঘ হাত আর পা দিয়ে জাপটে ধরেছে আমাকে, আঁকড়ে ধরেছে আমার চুল আর পিঠের জামা। নখগুলো ছুরির মতো বিঁধছে আমার সারা গায়ে। আর সেই ভয় জাগানো অজানা পুরুষালি গলায়, স্যাঁওতালি ভাষায় কাকে যেন কিছু অভিশম্পাত করে চলেছে সে।

বুঝতে পারছি না, আমি জাস্ট বুঝতে পারছি না যে আমার কী করা উচিত!

এমন সময় অসাধ্যসাধন করল দীপাঞ্জন। দৌড়ে এসে আমাকে একঝটকায় সরিয়ে দিয়ে নিজের দিদির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল ছেলেটা—দিদি রে, অমন করিস না রে দিদি। আমি তো আছি রে দিদি...অমন করিস না আমার যে ভয় লাগে রে দিদি...' বলে দু'হাত দিয়ে সেই ছেলেটা হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরল তার একমাত্র সহোদরাকে।

ভালোবাসার কী অপার মহিমা। চোখদুটো একবার বন্ধ করে খুলল মহুয়া, দেখলাম চোখের মণি আবার স্বস্থানে। সেই লাল লাল জ্বরচোখ মেলে মাত্র একবার দীপাঞ্জনের দিকে চাইল, আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল মেয়েটা। আমিও হাঁপ ছেড়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার অবসর পেলাম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে বুঝলাম যে, আক্ষরিক অর্থেই অথৈ জলে পড়েছি। কাল রাতের বৃষ্টিতে চারিদিক জলে থই-থই করছে। বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যাচ্ছে যে কাল রাত্রের বৃষ্টিতে অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গলের কী উথালপাতাল অবস্থাটাই না হয়েছে। আকাশ যদিও পরিষ্কার, কিন্তু বাতাসে শীতের কামড় বড় তীব্র হয়ে উঠেছে এই একরাতেই। রেশন যা এনেছি তাতে হয়তো আরও দিন দুয়েক চলে যাবে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে মহুয়াকে নিয়ে বরাভূম স্টেশন অবধি পৌঁছব কী করে?

সকালবেলা মহুয়াকে তুলতে গিয়ে দেখি একরাত্রেই মেয়েটার শরীর যেন ভেঙে পড়েছে আরও। নিঃসাড় আর নির্জীব ঘোলাটে দুচোখে ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি, রুখুসুখু চুলগুলো উড়ছে পাগলির মতো। এই একরাতেই অমন চাঁপাকলির মতো আঙুলগুলো শুকিয়ে কালো দড়ির মতো হয়ে গেছে। দেখলে মনে হচ্ছে যে চাপচাপ কালশিটে পড়েছে দুই হাত জুড়ে। অমন সুন্দর হাত দুটোর দিকে চাইতে আমার ভয়ই করছিল।

সকালে মহুয়াকে অতি কষ্টে একটা ব্রেড জ্যাম খাইয়েছি। মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। জ্বর, কষ্ট, এসব বাদ দিয়েও বোঝা যাচ্ছিল যে পেটের অসহ্য ব্যথাটা পাগল করে তুলছে ওকে, ওর গায়ে আর কষ্ট সহ্য করার কোনও শক্তিই অবশিষ্ট নেই। ওকে দেখে আমার থেকে থেকে চোখ ফেটে জল আসছিল। শুধু মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, হে ঠাকুর, ভালোয় ভালোয় মেয়েটাকে কলকাতা নিয়ে যেতে দাও।

কিন্তু ঠাকুর কথাটা শুনলেন না।

সকাল সকাল মংলাদা এসে গেছিল। ওর মুখেই শুনেছিলাম রাস্তায় পড়ে থাকা গাছের ডালপালা, মরা কুকুর বেড়াল আর পাখির ছানা ইত্যাদি সরিয়ে কত কষ্টে আজ আসতে পেরেছে সে। পুরুলিয়াতে এরকম বৃষ্টি নাকি বহুদিনের মধ্যে কেউ দেখেনি। গ্রামের দিকে অবস্থা নাকি আরও খারাপ। অনেক বাড়ির মাটির দেওয়াল ধ্বসে পড়েছে, মারা গেছে বেশ কিছু হাঁস মুরগি আর ছাগল। সাপে কেটে মারা গেছে একজন, গাছের ডাল মাথায় পড়ে আহত বেশ কিছু। এখনও অনেক জায়গাতেই জল জমে আছে।

দীপাঞ্জন ব্রেকফাস্টের নামে নাকেমুখে দুটো গুঁজেই মংলাদা'কে নিয়ে বেরিয়ে গেল বরাভূম স্টেশনের দিকে, কলকাতাগামী যে কোনও ট্রেনের তিনটে টিকেট কাটার জন্যে। কিন্তু বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওরা যখন ফিরে এল তখন বুঝলাম যে পরিস্থিতি যতটা ভেবেছিলাম তার থেকেও অনেক খারাপ। কাল রাতের প্রবল বৃষ্টিতে অনেক জায়গায় লাইনের ওপর জল জমে গেছে, ট্রেন চলাচল আপাতত বন্ধ। অনেক ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। আশা করা যাচ্ছে, বিকেলের দিকে জল নেমে গেলে ট্রেন চলাচল আবার স্বাভাবিক হবে। তবে সেও কথার কথা, মানে হলে হবে, এইমাত্র। তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

কথাটা যে আমাদের খুবই চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল সেটা বিস্তারিত না বললেও চলে। আমার টুটাফুটা কাজ চালানো গোছের ফার্স্ট এইড, আর বরাভূম স্টেশনের মেডিসিন স্টোর থেকে কিনে আনা কিছু ব্যথা কমানোর

ওষুধ, এই নিয়ে মেয়েটার কতটাই বা আর চিকিৎসা করা যায়? স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র একেই এখান থেকে বেশ খানিকটা দূর, তার ওপরে সেখানে কীরকম কী চিকিৎসা পাওয়া যাবে তার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। ফলে ট্রেনের জন্যে বুকে পাথর বেঁধে অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কী?

দুপুর নাগাদ মনে হল এ যাত্রা বোধহয় মেয়েটাকে আর বাঁচানো গেল না। একশো তিন ডিগ্রি জ্বর আর অসহ্য পেটব্যথার সঙ্গে শুরু হল রক্তবমি। আর সে কী ভয়ানক রক্তবমি! মনে হল মেয়েটার পেটের মধ্যে থেকে যেন থকথকে কাদার মতো কালো রক্ত উঠে আসছে ভলকে ভলকে। যেমন বীভৎস তার রং, তেমনই উৎকট তার দুর্গন্ধ, পেটের নাড়িভুঁড়ি উঠে আসে প্রায়। ওকে সামলাতে গিয়ে আমারই বমি হল বারদুয়েক। বমিটমি করে আরও নেতিয়ে গেল। তারপর একটা ব্যথার ওষুধ খেয়ে সামান্য শুয়েছে মেয়েটা। আমি আর দীপাঞ্জন দুজনে কাহিল হয়ে সামনের বারান্দায় বসে আলোচনা করছি যে কখন ট্রেন চলাচল চালু হতে পারে, আর চালু হলে কী করে স্টেশন অবধি মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়া যাবে, এমন সময় শুনি গেটের বাইরে টেম্পোর প্যাঁ-পোঁ আওয়াজ।

এ আওয়াজ আমার খুব চেনা। এটা বুধনদা'র টেম্পোর আওয়াজ।

আমি তো অবাক, তেমনই আশ্চর্য! এই এত বৃষ্টির পরেও, এইরকম অবস্থার মধ্যে লোকটা এল কী করে? তবে প্রথমেই যেটা মাথায় এল সেটা হচ্ছে যে বুধনদা হল গিয়ে এই এলাকার বহু পুরোনো লোক। কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে নিশ্চয়ই। ডুবন্ত মানুষ যেভাবে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, ঠিক সেইভাবে আমি আর দীপাঞ্জন প্রায় পড়িমরি করে দৌড়ে গেলাম গেটের দিকে। আর গিয়েই দেখি বুধনদা একা আসেনি! এই ঘোর সঙ্কট সময়ে সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে আরও দুজনকে!

সেই দুজনেই অবশ্য এখানকার লোক। পরনে যদিও বাহারি শহুরে পোশাক, দেখলেই বোঝা যায় যে তারা কলকাত্তাই আদবকায়দায় অভ্যস্ত। তাদের দেখে তো আমি যেমন অবাক তেমন বিব্রত। মহুয়ার এই অবস্থায় কোনও গেস্টকে এন্টারটেইন করার কথা আমি ভাবতেই পারি না। আর এতসব বৃষ্টিবাদল পেরিয়ে এখানে এরা এল কেন? কীভাবেই বা এল?

আহা, তখন যদি জানতাম যে শেষতক এদেরই একজন আমাদের দুঃখত্রাতা শ্রীমধুসূদন হয়ে দাঁড়াবে!

তাদের মধ্যে যাকে দেখেই দীপাঞ্জন দৌড়ে গেল জড়িয়ে ধরবে বলে, তার নাম জোশুয়া, জোশুয়া হেমব্রম, ওর কলেজের বন্ধু। আর সঙ্গের ছেলেটা জোশুয়ার দাদা পিটার, পিটার হেমব্রম। দীপাঞ্জনই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আমাদের। ওর মুখেই শুনলাম যে পিটার আর জি করে ডাক্তারি পড়তো। সবে পাশ করে, হাউস সার্জেনশিপ শুরু করেছে।'

'এই কী সেই পিটার হেমব্রম যার কথা তুমি প্রথমে বলেছিলে? সেই যার পারিবারিক গল্পগাথা শুনে...' কম কথা বললে কী হবে, অরিজিৎ ওরফে অ্যারির মেমরি যে অত্যন্ত শার্প সে কথা মানতেই হবে।

বেশ খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়লেন পিসি। মনে হল কী যেন একটা মনে করার চেষ্টা করছেন। তারপর ফের বলতে শুরু করলেন।

আমরা ওদের নিয়ে বারান্দায় এসে বসতেই রেংতা কোথা থেকে উদয় হয়ে হাঁউমাঁউ করে সাঁওতালি ভাষায় কীসব বলতে লাগল, আমরা তার বিন্দুবিসর্গ বুঝলাম না। শুধু বুঝলাম যে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোর অবস্থা দেখে সে ভারি চিন্তিত হয়ে পড়েছে, এবং সে আশা করছে যে এইবার কিছু অন্তত সুরাহা হবে। রেংতাকে একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে বলে আমরা পুরো ব্যাপারটা খুলে বলা শুরু করলাম। এরপর আমাদের সমস্ত বিপদ বিস্তারিতভাবে বলতে লাগল ঠিক চার মিনিট। আর ছ'মিনিটের মাথায় পিটার লেগে পড়ল মৃতপ্রায় মহুয়ার পরিচর্যা করতে। এখানে বলে রাখি যে, পিটার তার ডাক্তারি ব্যাগটি নিয়ে আসতে ভোলেনি। ঘরের ভেতর পিটার উদ্বিগ্ন মুখে মহুয়ার পরিচর্যা করছে, আর বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জোশুয়া বলতে লাগল যে ঠিক এখনই এরা এখানে এল কী করে।

আগেই বলেছি যে, দীপাঞ্জন বেশ খানিকটা কসরৎ করেই এই বাংলোতে তিনদিন থাকার অনুমতি জোগাড় করেছিল। এই জোশুয়ার বাবা হচ্ছেন স্টেট ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের উচ্চপদস্থ করণিক। জোশুয়ার বাবাকে ধরেই যে এই মহার্ঘ অনুমতিটি আদায় হয়েছিল সেটা আন্দাজ করতে বেশি কষ্ট করতে হয় না। জোশুয়ার দেশের বাড়ি বা গ্রামের বাড়ি, সেটা আবার আমাদের বুধনদার গাঁয়ে। এরা দুইভাই উইকেন্ডের ছুটি কাটাতে এসেছিল গ্রামের বাড়িতে। আর এসে দেখে এই বিপর্যয়!

কাল রাতের প্রবল বৃষ্টি দেখে বুধনদাও যেমন চিন্তিত হয়েছে আমাদের কী হাল হল সে নিয়ে, এরাও তেমনই চিন্তিত হয়েছে, কারণ জোশুয়া জানতোই যে আমরা কোথায় আছি। গ্রামেগঞ্জে সবাই সবার খবর রাখে। ফলে দুপুরের দিকে জল একটু সরতে দেখে যেই না বুধন'দা টেম্পো নিয়ে বেরিয়েছে এখানে আসবে বলে, এরাও বেরিয়ে পড়েছে সঙ্গে-সঙ্গেই। ওদের গ্রাম থেকে এখানে আসতে যেতে প্রায় দু'ঘণ্টার রাস্তা। সেটা আজকে পেরোতে ওদের লেগেছে পাঁচ ঘণ্টার কিছু বেশি।'

পিটার ওর সঙ্গে থাকা কিট থেকে যন্ত্রপাতি বার করে অনেক কষ্টে কিছু পরীক্ষাটরিক্ষা করল। ওর কপালের গভীর ভাঁজ দেখেই বুঝেছিলাম যে কেস বহুত গড়বড়। আমাকে বাইরে ডেকে পিটার বলল যে, 'খুব সিভিয়ার ইনফেকশন। শরীরের অবস্থা ভালো নয়। হার্টবিট একশোর ওপরে। ব্লাড প্রেশার সিক্সটি বাই ফর্টি। যে কোনও মুহূর্তে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে। কিন্তু'...এই বলে ভ্রু কুঁচকে কী যেন একটা ভাবতে লাগল পিটার।

কিন্তু কী? জিগ্যেস করতেও আমার বুক কাঁপছিল।

তার সঙ্গে আরও কিছু একটা আছে যেটা ধরতে পারছি না। আরও বেশ কিছু টেস্ট দরকার, সেসব কলকাতার ফেসিলিটি ছাড়া করানো অসম্ভব। আমার সিনিয়রকে একবার আনতে পারলে হত...এই বলে ভ্রু কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটি। তারপর বলে, জোশুয়াকে একটু কাছেই এক জায়গায় পাঠাচ্ছি, কয়েকটা জিনিস আনার জন্যে। আমার যেন কেমন অন্য একটা সন্দেহ হচ্ছে।

কী সন্দেহ পিটারদা? জিগ্যেস করে দীপাঞ্জন।

পিটার প্রথমে কিছু বলে না। অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে থাকে সে। তারপর বলে, 'জানি না কথাটা আপনাদের বলা ঠিক হচ্ছে কি না। আপনারা শহুরে লোক, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। আমিও যদিও তাই, কলকাতা শহরে ডাক্তারি পড়েছি, নিজেকে অশিক্ষিত বলি কী করে?

কিন্তু আমার মতে এখন এখানে এমন কিছু একটা ঘটছে, যেটাকে আমাদের চেনাজানা জগতের বাইরের ঘটনা ছাড়া এক্সপ্লেইন করা যায় না। জানি এই কথাটা শুনে হয়তো আপনারা আমাকে অশিক্ষিত গাঁইয়া ভূত ভাববেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটা বোধহয় আমাদের চেনা পৃথিবীর জাগতিক নিয়মকানুনের বাইরের অতিলৌকিক কিছু একটা ব্যাপার। কোনও ইনফেকশন, সে যতই মারাত্মক হোক না কেন, একদিনের মধ্যে রুগিকে এই অবস্থায় নিয়ে আসতে পারে না। আরও অনেক টেকনিক্যাল টার্ম বলতে পারি, যেগুলো বললে হয়তো আপনারা বুঝবেন না। তারা কিন্তু যা ঈঙ্গিত করছে, তাতে আমার বিশ্বাসটাই বদ্ধমূল হচ্ছে।

কী বলতে চাইছ সেটা একটু খুলে বলবে পিটারদা? কান্না ভেজা গলায় জিগ্যেস করল দীপাঞ্জন।

'দ্যাখ ভাই, সোজা কথা বলছি, আমার মনে হচ্ছে তোর দিদির যা অবস্থা দেখছি, তাতে এটা কোনও স্বাভাবিক ইনফেকশন বা সেইরকম কিছু ভাবতে আমার অসুবিধা আছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বেশ কিছু প্যারামিটার এতটাই নেমে গেছে যে, কারেন্ট মেডিক্যাল সায়েন্স দিয়ে সেসব এক্সপ্লেইন করা যাচ্ছে না। আমার কাছে এখন চ্যালেঞ্জ নেক্সট তিন থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে এঁকে অন্তত কলকাতা যাওয়ার মতো সুস্থ করে তোলা। নইলে যে রেটে ভাইটাল সাইনগুলো ফল করছে তাতে এই রাতটা কাটা মুশকিল। আমার বিদ্যায় এমন কোনও ওষুধ নেই যা এই অসাধ্যসাধন করতে পারে। এক যদি না...।

আমার বুকের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেছিল, সেই অবস্থাতেই ক্ষীণ গলায় জিগ্যেস করলাম, এক যদি না কী, পিটারদা?

আমার আর দীপাঞ্জনের দিকে একবার বড় বড় করে চোখ মেলে তাকাল সেই নবীন ডাক্তারটি, তারপর গলাটা খানিকটা নীচু করে বলল, 'একটা শেষ চেষ্টা করে দেখছি দীপান্বিতা, জানি না সফল হব কি না।

কী চেষ্টা পিটারদা? জিগ্যেস করতে বাধ্য হলাম।

আমাদের পরিবারে কিছু চালু আদিম চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন আছে, বুঝলে। এইসব চিকিৎসা পদ্ধতি বেশ কয়েক হাজার বছরের পুরোনো। বংশানুক্রমে এসব গুপ্তবিদ্যা আমাদের ফ্যামিলিতে চলে আসছে। আমি জেনেছি আমার বাবার কাছ থেকে। তিনি জেনেছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। বাড়ির ছেলেরাই একমাত্র এই জ্ঞানের ন্যায্য অধিকারী হয়।

এই চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে আছে বেশ কিছু মন্ত্র আর ওষুধ। সব ওষুধই হার্বাল, মানে এই জঙ্গলেই পাওয়া যায় এমন লতাপাতা দিয়ে তৈরি। জানি তোমরা শুনলে হয়তো নাক সিঁটকোবে, আমাকে গেঁয়ো ভূত ঠাওরাবে। কিন্তু ছোটবেলায় আমার বাবাকে দেখেছি এইসব ওষুধপাতি দিয়ে অবিশ্বাস্য সব ভেলকি দেখাতে। শ্মশানের পথে রওনা দেবে দেবে করছে, এমন লোককেও দেখেছি বাবার দেওয়া ওষুধ দু'ফোঁটা খেয়ে উঠে বসতে।

কিছু কিছু বিষকাটানের ওষুধ আর মন্ত্রতন্ত্র আমার বাবা আমাকে শিখিয়ে গেছিলেন। আজ তারই মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক, সবচেয়ে জটিল যে ওষুধটি, তারই জিনিসপত্র আনতে পাঠিয়েছি জোশুয়াকে। যদি আমার ছোটবেলায় শেখা বিদ্যা একেবারে ব্যর্থ না হয়ে থাকে, তবে আশা করি অন্তত কয়েকঘণ্টা এনাকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারব, সে যতবড় বিষক্রিয়াই হোক না কেন।' খুবই গম্ভীর শোনাচ্ছিল পিটারের গলার স্বর।

আমার সব কিছু ফের গুলিয়ে গেল। কে কোথাকার ডাক্তার, কার্যগতিকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, তার মুখে এসব হাজার বছরের পুরোনো কোন 'বিষকাটানের ওষুধ'-এর কথা শুনছি? এসব তুকতাক বিষয়ে আমার কোনওদিনই কোনও ইন্টারেস্ট ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কী করা উচিত সেটা একদমই বুঝতে পারছি না!

ব্যাপারটা ঠিক করে বোঝার আগেই রেংতা আর মংলাদা এসে আমাকে বারান্দার একদিকে টেনে নিয়ে এল। ওদের মুখচোখ দেখেই বুঝলাম যে, দুজনে কিছু একটা প্ল্যান করেছে, দুজনেরই গম্ভীর মুখে খেলা করে বেড়াচ্ছে একটা চাপা উত্তেজনা।'

পিসি একটু থামলেন, জল খেলেন। তারপর গলাটা একবার পরিষ্কার করে ফের শুরু করলেন।

'ওদের কথা শুনে বুঝলাম যে, গতকাল রাতে বারান্দায় সেই ভয়াবহ আবির্ভাবটির ব্যাপারে রেংতা আমাদের মংলাদা'কে যথেষ্ট ভালোভাবেই অবহিত করেছে। তার সঙ্গে অতর্কিতভাবে মহুয়ার এতটা শরীর খারাপ হওয়াটা ওরা ঠিক স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারছে না। ওদের মতে এসব ঠিক স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এর পেছনে নাকি তাঁরা আছেন।

তাঁরা কারা? আমি জিগ্যেস করেছিলাম।

দেও'রা। বোঙ্গারা। ওঁরা রাগলেই এইরকম সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটে। তখন ভালোমানুষদেরও অমন কষ্ট পেতে হয়। দোহাই দিদি, আমাদের কথা শুনে তুমি একটিবার ভৈরবী মায়ের থানে চল। মৌদি'র এত কষ্ট আর দেখা যায় না যে। একটি বার আমাদের কথা শোনো দিদি, যদি ভালো হয়? ক্ষতি তো কিছু নেই।'

কী জানিস, ওইরকম একটা পরিস্থিতিতে, অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গলঘেঁষা সেই পুরোনো ব্রিটিশ আমলের বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেলো। সে তোরা আমাকে ভীতু, বা কুসংস্কারগ্রস্ত বা অন্যকিছু বলতে পারিস, কিন্তু সেইখানে দিশেহারা অবস্থায়, ওইরকম পরিস্থিতিতে আমার মাথা আর কাজ করছিল না। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল এই লোকদুটো যা বলছে তা সত্যি হলেও হতে পারে!

ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, কার কথা যেন বললে, কোন মা না কী যেন, ওখানে গেলে কোনও সুরাহা হতে পারে বলছ?

দুজনেই যেন একটু শিউরে উঠল কথাটা শুনে, মংলাদা তো হাতদুটো নমস্কারের ভঙ্গীতে মাথায় ঠেকিয়ে নিল একবার রেংতা বলল, ওমন বোলো না দিদি, ভৈরবী মা সাক্ষাৎ দেবী গো। ভূতপ্রেত দত্যিদানো সব্বাই মায়ের আঁচলে বাঁধা থাকে যে। নইলে গেল মাসে বলরাম মাহতোর প্রায় মরে যাওয়া মেয়েকে সারিয়ে তোলা কী যার তার কম্মো গো দিদি?

দুজনে আরও অনেক আগড়ম বাগড়ম বকে যাচ্ছিল। অতি কষ্টে সেসব থামিয়ে দুজনের ভক্তিপ্রণত প্রলাপ শুনে যেটা উদ্ধার করলাম সেটা হচ্ছে যে এই ভৈরবী মা তান্ত্রিক বা তন্ত্রবিদ গোছের কোনও সাধিকা কেউ। বেশিদিন হল এখানে আসেননি, কিন্তু এর মধ্যেই খুবই জনপ্রিয় হয়ে পড়েছেন স্থানীয়দের মধ্যে। মোটমাট বোঝা গেল এখানকার লোকেদের দৃঢ় বিশ্বাস মা বিশেষ দৈবী শক্তির অধিকারী। তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লে কিছু না একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

খানিকক্ষণ ভেবে জিগ্যেস করলাম, 'কোথায় যেতে হবে? কত দূরে?

ভাবছিলাম যাওয়াটা ঠিক হবে কি না। আরও ভালো করে বলতে গেলে, গিয়ে কোনও লাভ আছে কি না। অন্যমনস্ক হয়ে একবার আমাদের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

আমার চোখ পড়ল বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশে যাওয়া মহুয়ার মুখের দিকে। তারপর আর ভাবিনি। রেংতাকে আর দীপাঞ্জনকে মহুয়ার কাছে রেখে আমি বুধনদা আর মংলাদা'র সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

'সেই মায়ের থানে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন ঘোর সন্ধে। কী করে যে সেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে বনবাদাড় পেরিয়ে ভৈরবী মায়ের কাছে পৌঁছলাম সে কথা জিগ্যেস করিসনি, সে আমার মনেও নেই। ঘোর বিপদের মুখে আমরা এমন সব কাজ করে ফেলতে পারি, যেটা হয়তো স্বাভাবিক অবস্থায় করার কথা চিন্তাই করতে পারতাম না। বুধনদা আর মংলাদা না থাকলে যে ওই জায়গায় যেতে পারতাম না সে কথা বলাই বাহুল্য। ওরা জঙ্গলের লোক, হাতের তালুর মতো চেনে জায়গাটাকে।

শেষমেশ যেখানে এসে উপস্থিত হলাম সেটা অযোধ্যা পাহাড়ের, যাকে বলে পাদদেশ, সেইরকম একটা জায়গায়। একটা ছোট শুঁড়িপথ হাঁচোরপ্যাঁচোর করে উঠে এসে দেখি একটা বেশ বড় চাতাল, আর তার সামনে একটা ছোট গুহা মতো। সঙ্গী দুজনের প্রণামের ঘটা দেখে বোঝা গেল ভৈরবীমা এখানেই থাকেন।

দুজনে খানিকক্ষণ ইতস্ততভাবে মৃদুস্বরে ডাকাডাকি শুরু করার মিনিটখানেকের মাথায় গুহার মুখে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে বুধনদা আর মংলাদা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে মা'কে বোঝাতে লাগল কেন সন্ধের পর মায়ের কাছে আসা বারণ থাকা সত্ত্বেও আজ ওরা আমাকে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। একটা নির্দোষ মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই যে এটা করা সে কথাও বারবার বলতে লাগল দুজনে।

আমি ভৈরবীমায়ের দিকে চেয়েছিলাম। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, ইনি এদিককার লোক নন। উচ্চতায় খুব বেশি হলে পাঁচ ফুটের একটু ওপরে। দোহারা চেহারা, পরনে গেরুয়া শাড়ি। মাথায় একঢাল চুল জটা বেঁধে আছে। তবে আমাকে সবচেয়ে বেশি যেটা আকর্ষণ করল সেটা হচ্ছে ওনার মুখশ্রী। একটা অদ্ভুত প্রশান্তি ছেয়ে আছে সারা মুখে। সেখানে কোনও কষ্ট, কোনও দুঃখ, কোনও চিন্তা বা উদ্বেগের চিহ্নই নেই। দেখলেই বুকের ভেতরটা কেমন ঠান্ডা হয়ে যায়। বুধনদা আর মংলাদা'র কথা শুনেটুনে হাতের ইঙ্গিতে ভৈরবীমা আমাদের ভেতরে আসতে বললেন। আমরাও ওনার পেছন পেছন একটু মাথা নীচু করে গুহায় ঢুকে পড়লাম।

গুহার ভেতরে গিয়ে দেখি তেমন সরঞ্জাম কিছুই নেই। একটা বড় মাটির প্রদীপ জ্বলছে একপাশে, আর একপাশে একটা মাটির কলসী, বোধহয় জল খাওয়ার জন্য। আমার চোখ পড়ল মেঝেতে পেতে রাখা জীর্ণ, কিন্তু মস্তবড় বাঘছালটার ওপর। আমি ওদিকে তাকিয়ে আছি দেখে অল্প হাসলেন উনি, তারপর দেহাতী

হিন্দিতে বললেন, ওটা আমার গুরুজির, অমৃতলোকে যাত্রা করার সময় আমাকে দিয়ে যান। উনি পেয়েছিলেন ওঁর গুরুজির কাছে। এই বলে মাথায় হাত ঠেকালেন। লক্ষ্য করলাম যে আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠ ওঁর।

ভৈরবী মা বোধহয় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিলেন আমার মনের অবস্থাটা। ইঙ্গিতে বসতে বললেন আমাদের তিনজনকে। তারপর আমাকে বললেন, 'ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে সেটা একটু বিস্তারিত বলবি? কিচ্ছু বাদ দিবি না কিন্তু।'

আমি বলতে শুরু করলাম সেই কলেজ স্ট্রিটের ঘটনাটা থেকে। তারপর আমাদের পুরুলিয়া আসা থেকে শুরু করে গতকালের ঘুগনি খাওয়া থেকে মহুয়ার অসুস্থ হয়ে পড়া অবধি বলতে সময় লাগল প্রায় দশ মিনিট।

তারপর চারজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম। নিশ্চুপ নিস্তব্ধ সেই কয়েকটা মুহূর্ত আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেন অনন্ত সময়।

বুধন! সেই নৈঃশব্দ খান খান করে গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন ভৈরবীমা,—প্রদীপটা নিভিয়ে দাও, আমি ধ্যানে বসব। আজ শুক্লা নবমী, দেখি জগন্মাতার কৃপা হয় কী না।

বুধনদা চুপচাপ উঠে প্রদীপটা হাতের বাতাস দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে আমার পাশে এসে বসল। আর এতক্ষণ যে অন্ধকার অনেক চেষ্টা করেও গুহাতে ঢুকতে পারছিল না, সে যেন খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর।

আশেপাশে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, এমন ঘন অন্ধকার। বাইরে ঝিঁঝিপোকার আওয়াজটা যেন বহুগুণ বেড়ে উঠল। তারই মধ্যে জঙ্গলের ডালপাতা ঝরার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, ভেজা মাটি থেকে উঠে আসছে জংলি সোঁদা গন্ধ। আমরা চুপচাপ বসে আছি, এমন সময় শুনলাম ভৈরব মা বড় করে একটা শ্বাস নিলেন, আর অসম্ভব একটা গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, ওওওমম।

আর তারপরেই সামনের দৃশ্যটা দেখে আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

কী দেখলে পিসি?' আমার গলা থেকে যে অমন চিঁ-চিঁ আওয়াজ বেরোতে পারে, সেটা আমি নিজেও জানতাম না।

পিসি আমাদের দিকে বড়বড় চোখ করে তাকালেন, তারপর বললেন, কী দেখলাম জানিস? দেখলাম যে যেখানে ভৈরবী মা বসেছিলেন, সেখানে মায়ের পেটের দিকে, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে নাভির জায়গায়টায় যেন একটা ধীর আলোর পদ্ম ফুটে উঠল!

ব্যাপারটা বলতে যতটা স্বাভাবিক লাগছে, দেখলে অতটা স্বাভাবিক লাগার কথা নয়, বুঝতেই পারছিস। পুরুলিয়ার কোন জঙ্গলের মধ্যে এক আদিম আরণ্যক গুহা, তার মধ্যে ধ্যানরতা তন্ত্রসিদ্ধা মায়ের শরীরের ভেতরে আলো জ্বলে উঠছে, এসব বাইরের লোক শুনলে গাঁজাখুরি গল্প ভাববে। অথচ তখনও কিছুই ঘটেনি, আমার অবাক হওয়ার তো সবে শুরু!

এরপর আলোটা আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগল।

ব্যাপারটা এতই অস্বাভাবিক যে বলে বোঝাতে পারব না। মানুষের শরীরের ভেতরে আলো, সেটা আবার নড়েচড়ে, এসব দেখে আমার স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি সব গুবলেট হয়ে গেছিল। অথচ কিছু অস্বীকার করার নেই, যা ঘটছে সেটা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে! তবে যেটা দেখে সত্যি আমার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হল, সেটা হচ্ছে আলোর পদ্মটা যে পথ ধরে ওপরে উঠছে সেই পথটা। স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে পথটা আমার খুব চেনা, কিন্তু নিজেকে কিছুতেই সেটা বিশ্বাস করাতে পারছি না।

ওটা পথ নয়, ওটা মানুষের শরীরের একটা অংশ।

ওটাকে বলে মেরুদণ্ড, শিরদাঁড়া!

ওই আলোর ফুল ভৈরবী মায়ের শিরদাঁড়া বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠছে। ঠিক সাপের মতো!

আমরা নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে বসে আছি। পেছন থেকে মংলাদা'বা বুধনদা, কোনও একজনের দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার খটাখট শব্দ কানে আসছে। আমার চোখের পলক পড়ছে না, কোনওদিন যে এরকম দৃশ্য দেখতে পাবো সে কথা আমার কল্পনার অতীত ছিল।

এইবার লক্ষ্য করলাম শুধু যে ওটা উঠতে লাগল তা নয়, ধীরে ধীরে আরও ফুটতে লাগল। যখন সেই আলোর পদ্ম মায়ের গলার কাছাকাছি, তখন এক অলৌকিক স্নিগ্ধ দ্যুতি মায়ের সারা শরীর জুড়ে খেলা করছে।

সেই আলোর পিণ্ড যখন কণ্ঠার কাছাকাছি, তখন সেই আলোয় মায়ের শরীর যেন ঝলমল করছে। তার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম ভৈরবীমায়ের মাথার পেছনে ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে একটি স্বচ্ছ জ্যোতির্বলয়। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাচন্দনের আলোয় ভেসে যাচ্ছে ছোট্ট গুহাটি। সেই আলোয় দেখতে পাচ্ছি যে ভৈরবীমায়ের চোখ বন্ধ, বজ্রাসনে বসে আছেন তিনি। তাঁর সারা শরীর ঘিরে খেলা করছে এক আশ্চর্য মায়াময় আলোর স্রোত। তাঁর মুখে জেগে আছে গম্ভীর, প্রশান্তচিত্ত ভাব।

গলার কাছ অবধি সেই আলোকপদ্ম পৌঁছতেই গভীরভাবে নিঃশ্বাস ছাড়লেন ভৈরবীমা। আর সেই অদ্ভুত আলোর খেলা দপ করে নিভে গেল।

মংলাদা বা বুধনদা, কেউই প্রদীপ জ্বালানোর অবস্থায় ছিল না। বুধনদা'র কোঁচড় থেকে দেশলাই নিয়ে সে কাজটা আমাকেই করতে হল।

প্রদীপ জ্বলে উঠলে দেখলাম মায়ের মুখটা গম্ভীর আর ভ্রুকুটিকুটিল হয়ে আছে। মাথা নীচু করে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন তিনি, তারপর মেরুদণ্ড টানটান করে সোজা হয়ে বসলেন, আর আমার দিকে চেয়ে বলতে শুরু করলেন।

শোন রে মেয়ে। তোর বন্ধুর ওপরে কেউ তুক করেছে, আর করেছে খুব বড় কোনও গুণিন বা গুণিনেরা। এমনকী প্রাচীন ডাকিনীবিদ্যায় পারদর্শী কেউ হলেও অবাক হব না, এতই ভয়ঙ্কর সেই কালোজাদু। মারণ উচাটন বুঝিস?

ও দুটো বিষয়ে জানা ছিল কিছু কিছু। নিজের অজানতেই ঘাড় নাড়লাম।

তবে শুনে রাখ, যে বিষ এই মুহূর্তে তোর বন্ধুর শরীরে কালকেউটের মতো বাসা বেঁধে আছে, তার থেকে জটিলতম, বীভৎসতম, অব্যর্থতম মৃত্যুবাণ আর নেই, ভৈরবীমায়ের গম্ভীর গলায় যেন গমগম করতে লাগল গুহাটা।—অনেক শোকতাপ পেয়ে তবেই এই তুক করার রাস্তা বেছেছে কেউ। মনের মধ্যে জ্বলতে থাকা দহনজ্বালা যখন সহ্যের অতীত হয়ে যায়, তখন তার থেকে মানুষের চিন্তায় ভয়ঙ্কর বিষ উৎপন্ন হয়। তার পাপপুণ্য, ভালোমন্দের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। এত দুঃখকষ্ট, জ্বালা পেরিয়ে এই মহাবিষের উৎপত্তি, তাই এর কোনও প্রতিষেধক নেই বললেই চলে।

কী সেই বিষ, মা? জিগ্যেস করতে গিয়ে গলাটা আমার কেঁপে গেল।

ফিসফিস করে দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন ভৈরবীমা, আর আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ভয়ের হিমেল স্রোত যেন নেমে গেল।

কালিয়া মাসান!

এই শব্দ দুটো বারবার উচ্চারণ করেছে লোকটা, মিলিয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে প্রত্যেকবার। তখন বুঝিনি, আজ ভৈরবীমায়ের কথা শুনে বুঝতে পারছি, কোন অভিশাপ বয়ে এনেছে এই শব্দ দুটো আমাদের জীবনে!

সেইরকমই ধীর চাপা গলায় বলতে লাগলেন তিনি—

অকালে অপঘাতে মৃত কোনও শব দাহ করার পর তার যে ছাই পড়ে থাকে, সেটাই হচ্ছে কালিয়া মাসানের মূল উপাদান। সেই ছাই যদি বিশেষ তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শোধিত করা যায়, তবে তা হয়ে দাঁড়ায় অব্যর্থতম মৃত্যুবাণ। যাকে মারতে হবে, কোনও উপায়ে তাকে একবার খাইয়ে দিতে হবে সেই ছাই। ব্যস,

তারপর যতক্ষণ না স্বয়ং মৃত্যু এসে সেই হতভাগ্যটির প্রাণহরণ করে তাকে অশেষ কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দিচ্ছেন, ততক্ষণ সেই মন্ত্রপূত ছাই তার পেটে বসে থাকে, আর বিষসঞ্চার করে তার সারা শরীরে। তাকে ঘুমোতে দেয় না, উঠতে দেয় না, বসতে দেয় না। তার স্বপ্নে উঠে আসে নরকের বীভৎস, ভয়ঙ্করতম, পূতিগন্ধময়, নির্মম দৃশ্যাবলী। অপঘাতে মৃত যে মানুষটির শবদাহের ছাই খাওয়ানো হয়েছে, তার প্রেতাত্মা থেকে থেকে ভর করে অভিশপ্ত মানুষটির শরীরে।'

এর থেকে পরিত্রাণের কোনও উপায় নেই মা?

আছে। মৃত্যু।

আমার মনে হল যেন হৃৎপিণ্ডটা আমার গলার কাছে উঠে এসেছে। মুখ দিয়ে কথা সরছিল না আমার।

আমার বন্ধুকে কলকাতা নিয়ে যেতে চাই মা। কাল সকাল অবধি...

আমাকে থামিয়ে দিয়ে হাত তুললেন তিনি, ক্লান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, না। পারবি না। আজকের রাতটা কাটবে না।

নিজের বুকের ধ্বক ধ্বক শব্দটা নিজেই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

এর থেকে মুক্তির কোনও উপায়?—আমার গলায় আর কোনও সাড় ছিল না।

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন তিনি। তারপর কিছু ভেবে উঠে গেলেন গুহার একটু ভেতর দিকে, আর হাতে করে মালার মতো কী একটা নিয়ে এলেন। বিড়বিড় করে সেটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটা নিয়ে যা, তোর বন্ধুর গলায় পরিয়ে দিস। দেখি মহামায়া এই বেটির কথা শোনেন কি না।

মালাটা হাতে নিয়ে সভয়ে দেখি ছোট ছোট হাড়ের তৈরি মালাটা। কাঁপা-কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলাম, এটা কীসের মালা মা?

এ হল মহাশঙখের মালা। চণ্ডালের অস্থি দিয়ে তৈরি।

ভয়ে হাতটা কেঁপে গেল আমার, তারপর মন শক্ত করে হাতে নিলাম ওটাকে, 'এতে সব ঠিক হয়ে যাবে তো মাঈজি? আমার বন্ধু ভালো হয়ে যাবে তো? আকুলস্বরে প্রশ্ন করলাম।

বলতে পারব না রে বেটি। যেটা হাতে পেলে কিছু করতে পারতাম সেটা পাওয়ার কোনও উপায়ই নেই যে। দুঃখিত স্বরে বলেন তিনি।

কী সেটা, মাঈজি? আগ্রহে এগিয়ে বসলাম।

চুপ করে থাকেন সেই ভূয়োদর্শী তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ মহিলা। তারপর আমার চোখে চোখ রেখে বলেন, সেটা হচ্ছে, যে এই জাদুটোনা করেছে, তার রক্ত। তার রক্ত ছাড়া এই মৃত্যুবাণের আর কোনও প্রতিষেধক নেই।

গলার স্বরে কোথায় যেন একটা তিক্ত কৌতুকের রেশ শোনা যায়, আর তারই সঙ্গে এই রক্ত পাওয়া শুধু যে কঠিন তা নয়, অবাস্তবও বটে। কোনও মরমানুষের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া বা তার রক্ত পাওয়া।

এইবার বিস্মিত হওয়ার পালা আমার। মরমানুষের পক্ষে নাগাল পাওয়া শক্ত কেন? আর নাগাল পেলে তার রক্ত পাওয়া যাবে না কেন?

ভৈরবী মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার মনের কথা পড়ে ফেলতে বেশি সময় লাগল না ওনার। আমার চোখে চোখ রেখে স্থির স্বরে বললেন, এখনও বুঝিসনি, কেন ওর শরীর থেকে রক্ত পাওয়া সম্ভব নয়? সত্যি বুঝিসনি?

না মাঈজি, আমি বুঝিনি। রক্ত কেন পাওয়া যাবে না লোকটার? মানে ধরাটা খুব কঠিন হতে পারে, কিন্তু একবার ধরতে পারলে রক্ত...

'কারণ, একটু যদি বিচার করে দেখতিস মেয়ে, ফিসফিস করে বলেন তিনি, 'তাহলে অনেক আগেই বুঝতে পারতিস যে ওর শরীরে রক্তমাংস বলে আর কিছু নেই।' এই বলে থামেন তিনি। তারপর ওনার গলার স্বর আরও ঘন হয়ে আসে, আমার শিরশিরানি ভাবটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলেন তিনি, 'ওর শরীরটা শুধু ছাই দিয়ে তৈরি, ও ছাইয়ের মানুষ।

ভৈরবীমা'কে প্রণাম করে, সেই মহাশঙ্খের মালা নিয়ে বেশ রাতে যখন পৌঁছলাম বাংলোয়, তখন দেখলাম যে মহুয়ার অবস্থা আরও শোচনীয়, দেখেই মনে হচ্ছে যে, ওর শরীরে আর প্রাণ বলে কিচ্ছু নেই। নির্জীব হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়, মুখ দিয়ে অল্প অল্প গ্যাঁজলা উঠছে। দরজায় ঠেস দিয়ে বসে আছে দীপাঞ্জন, উস্কোখুস্কো চুল, কান্নাকাটি করে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছে ছেলেটা। তার পাশে শক্ত মুখে বসে আছে জোশুয়া। বন্ধুর এই বিপর্যয়ে সেও যে খুব বিচলিত, সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

শুনলাম ফেরার সময় স্টেশন হয়েই ফিরেছে জোশুয়া। রেংতার মোটর সাইকেল নিয়ে দাদার নির্দেশমতো বিভিন্ন জায়গায় গেছিল সে। আমাদের ফেরত আসার ঘণ্টাখানেক আগেই ফিরেছে আর যে খবরটা সঙ্গে করে এনেছে সেটা যে খুব খারাপ তা বলা যাবে না।

খবরটা হচ্ছে যে লাইনের ওপর থেকে জল সরে গেছে বিকেল থেকেই, ট্রেন চলাচল এক্কেবারে স্বাভাবিক। একবার যদি মেয়েটাকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারি...

এরই মধ্যে অবাক হলাম পিটারের আচার আচরণ দেখে। কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা একজন ডাক্তার যে শিলনোড়াতে বিভিন্ন অজানা লতাপাতা আর ছোট ছোট ফল পিষে, তাদের রস বার করে বিভিন্ন ছোট ছোট কাচের বাটিতে রাখতে পারে, সেটা দেখাটাও একটা অভিজ্ঞতা বটে।

আমি এসে দরজায় দাঁড়াতে আমার দিকে চোখ তুলে চাইল পিটার। আমি জিগ্যেস করলাম, এগুলো কী, পিটার?

সেসব পরে বলছি। আগে বলো ভৈরবীমাঈ কী বললেন?

এটা বলার পরই ওর চোখ গেল আমার হাতে ঝুলে থাকা সেই মহাশঙ্খমালাটির দিকে। সরু চোখে একবার তাকাল তার দিকে, আর মুহূর্তখানেক পরেই বিস্ফারিত হয়ে উঠল ওর চোখ দুটো। হাতের কাজ ছেড়ে দ্রুতপদে উঠে এল সে, বিস্মিত গলায় জিগ্যেস করল, 'এটা কোথায় পেলে দীপান্বিতা?

ওকে বলতেই হল আমাদের পুরো অভিযানের ঘটনাটা। পুরোটা মন দিয়ে শুনল পিটার। খেয়াল করলাম যে, ভৈরবীমায়ের শিরদাঁড়া বেয়ে আলোর ফুল ওঠার কাহিনিটা বর্ণনা করার সময় তন্ময় হয়ে একাগ্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে ও, দু'চোখে অপার বিস্ময় আর শ্রদ্ধার ভাব।

এটা নিয়ে কী করতে হবে সে কথা ভৈরবী মা কিছু বলে দেননি। আমি কী করব ঠিক করতে না পেরে শেষে মালাটা গিয়ে অতিকষ্টে মহুয়ার গলায় পরিয়ে দিলাম।

আর খেয়াল করলাম যে ওর গা'টা ঠান্ডা। ভীষণ ঠান্ডা। প্রায় মরামানুষের মতো।

পিটার ততক্ষণে ওর কাজ শেষ করে এনেছিল প্রায়, একটা বড় বাটিতে বিভিন্ন অনুপাতে মেশাচ্ছিল ওষুধ গুলো। মহুয়াকে মালাটা পরিয়ে দেওয়ার পর আমার দিকে তাকাল একবার, খেয়াল করলাম অসম্ভব গম্ভীর হয়ে আছে মুখটা। আমাকে শুধু একবার জিগ্যেস করল, কালিয়া মাসান? তাই বললেন ভৈরবী মা? ঠিক শুনেছো তুমি?

জলভরা চোখে মাথা নাড়লাম একবার।

মাথা নামিয়ে ফের নিজের কাজ করতে করতে বিড়বিড় করতে থাকে সে, কালিয়া মাসান তা হলে। আমিও তাইই ভেবেছিলাম, তাই সেইমতই এগুলো আনতে দিই। শোনো এখন যেটা বানাচ্ছি, এটাকে বলে মাসানকাটার রস। জটামাংসী, মারহাটিটিগা গাছের ফুল, গুড়মারবুটির লতা, হিমচাঁপার পাপড়ি, কাকমাচির ফল, ডুলিচাঁপা ফুলের কেশর আর এইটা, বলে একটা ছোট লতার কাটা অংশ তুলে ধরে সে—বিষকাটালীর ফুলশুদ্ধু লতা, এই হচ্ছে এর প্রধান উপাদান। কপাল ভালো যে এগুলোর সব কটাই একচান্সে পেয়ে গেছি। তবে যেটা ভাবছিলাম একেবারেই পাব না, সেটা হচ্ছে এইটা, বলে মার্বেল গুলির মতো কালো কালো

কয়েকটা কী যেন তুলে দেখাল,—কালধুতরোর বীজ। একমাত্র এই জঙ্গলেই পাওয়া যায়, গোখরো সাপের বিষের থেকে কম কিছু নয়। এ জিনিস খুঁজে পাওয়া অনেক ভাগ্যের কথা, বলে ফের কাজে মন দেয় পিটার।

ইয়ে, পিটার, তুমি কি জেনেশুনে এই কালধুতরোর বিষ মেশাচ্ছ ওষুধে?' সন্দেহ যায় না আমার। ধুতরো গাছের বীজ যে তীব্র বিষ সেটা জানা ছিল আমার।

মৃদু হাসে সেই শক্তপোক্ত শরীরের সাঁওতাল ছেলে, যা বিষ তাই অমৃত, যা অমৃত তাই বিষ, বাবা বলতেন। সবই নির্ভর করে তুমি যদি জানো কখন কতটা কীভাবে ব্যবহার করা উচিত তার ওপরে, তাই না?

আর, আর...কথাটা মুখে এসেও আটকে যায়, ভৈরবী মা যে বললেন যে...যে...যে লোকটা এই বিষ খাইয়েছে তার রক্ত লাগবে এই বিষের প্রতিষেধক হিসেবে?

রক্ত? ভুরু কুঁচকে যায় পিটারের, যদিও এ ওষুধ বড় ডেঞ্জারাস ওষুধ, বাবা বারবার বলতে, সামান্যতম ভুলচুকে মহাসর্বনাশ হয়। তবে মহারক্তের কথা তো তিনি বলেননি কিছু! এই মাসানকাটার একটি ফোঁটাও মাটিতে অবধি ফেলতে নেই, রোগীকে পুরোটাই খাইয়ে দিতে হয়, এত তীব্র এই বিষ-ওষুধ। তিনি এসব শিখেছিলেন আমার ঠাকুর্দার কাছ থেকে। তিনি আবার তাঁর বাবার কাছ থেকে। এঁরা কেউই জীবনে এক আধবারের বেশি বানাননি মাসানকাটার ওষুধ। হ্যাঁ, এটা শুনেছি যে এনারা কখনও নিজের হাতে এই ওষুধ কোনও রুগিকে খাওয়াননি, অন্য কারও হাতে, বিশেষ কারও হাতে খাইয়েছেন। কিন্তু, কই কোথাও তো কারও রক্তের কথা বলা নেই।

ফের সবকিছু গুলিয়ে যায় আমার। তাহলে ভৈরবীমা কি ভুল বললেন? উনি যে স্পষ্ট করে বললেন, যে প্রয়োগ করেছে এই অব্যর্থতম মৃত্যুবাণ, তারই রক্ত এই বিষের একমাত্র প্রতিষেধক?

ইতিমধ্যে সবকিছু তৈরি করে ফেলেছিল পিটার। এরপর ও আমাকে ছাড়া সবাইকে বলল ঘর থেকে চলে যেতে। ঘর খালি হলে আমার দিকে ঘুরল, তারপর গম্ভীর স্বরে বলল, এবার এই ওষুধটা ওকে খাওয়াতে হবে দীপান্বিতা। ওটা তোমাকেই খাওয়াতে হবে, কারণ আমি তখন মন্ত্র পড়ব। আমার বাবাকেও দেখেছি অন্য কাউকে দিয়ে খাওয়াতে। তবে সেটার জন্যে সবাইকে চলে যেতে বলিনি।

তাহলে?

ওষুধ খাওয়ানোর পর নেক্সট দুই থেকে তিনঘণ্টা মেয়েটা অসম্ভব কষ্ট পাবে। সে কষ্ট চোখে দেখা যায় না। ওই জন্যে বাকিদের সরিয়ে দিলাম। ওই সময়টুকুর জন্যে ওকে সামলে রাখাটা খুব জরুরি। যদি সেই সময়টা পেরিয়ে যায় তো এযাত্রা বেঁচে গেলো। নইলে...এই বলে চুপ করে গেল সে।

ওষুধটা খাওয়াতে তেমন বেগ পেতে হল না। একটা চামচ ওর দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ওষুধটা ঢেলে দিতে লাগলাম। আর তখনই খেয়াল করলাম যে ওর দাঁতগুলো কালো হয়ে আছে। মুখের নীলভাবটা আরও কালচে হয়ে উঠেছে। চোখদুটো বোজাই আছে, তাদের দুইপ্রান্তে শুকিয়ে যাওয়া চোখের জলের দাগ।

অর্ধেকটা খাইয়ে বাকি অর্ধেকটা পিটারের নির্দেশ মতো রেখে দিলাম।

এইসময় কানে এল স্যাঁওতালি ভাষায় উচ্চারিত কিছু মন্ত্র, সুরেলা গলায় কিছু একটা গাইছে পিটার।

ওষুধটা খাইয়ে পিটারের দিকে ফিরে বসলাম। দেখি একটা গ্লাস থেকে জল নিয়ে হাতে করে চারিদিকে ছিটোতে ছিটোতে সারা ঘরটা প্রদক্ষিণ করছে পিটার, আর সুর করে গাইছে,

'সের চাওলে কুপি সুনুম,
লেটের আদিঞ অগমকালি মাঈ।
নিয়া জাতরা অন্ত রেণা, কাথা কাল মাঈ,
লালই দেন্না তিং।

এর পরে দেখি পিটার ঘরের কোনা থেকে তিনটে মাটির পিণ্ড এনে মেঝের মাঝখানে এমন ভাবে রাখল, যেন মনে হচ্ছে একটা ত্রিভুজের তিনটে শীর্ষবিন্দু। সেই পিণ্ডগুলোতে তিনটে শালগাছের ডাল পুঁতল তারপর, আর একটা লাল সুতো দিয়ে ডালগুলোর মাথা বাঁধল। এরপর দরজা খুলে বাইরে গেল একটু, ফিরে এল মিনিটখানেক বাদে। আর এসেই যে জিনিসটা ওই ত্রিভুজের মধ্যিখানে রাখল সেটা দেখে শিউরে উঠলাম আমি।

একটা কালো মুরগির কাটা মাথা। কাটা মাথায় রক্ত লেগে আছে এখনও।

পিটার অবশ্য আমার শিউরে ওঠাটাকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে একের পর এক বিভিন্নসব বিচিত্র দর্শন পাথরের টুকরো, নাম না জানা পশুর লোম, শুকিয়ে যাওয়া সাপের মাথা, কাকের পা আর ধানদুব্বোর সঙ্গে লাল টকটকে কয়েকটা জবাফুল, এইসব জিনিস সেই কাটা মাথাটাকে ঘিরে রাখতে লাগল। এসব শেষ হওয়ার পর অতি যত্নে আধ আঙুল লম্বা, সাদা রঙের সূচল কী একটা যেন বার করে সেই কাটা মাথাটার ওপর রাখতে আমি সন্তর্পণে জিগ্যেস করলাম, 'কী ওটা?'

কালকেউটের বিষদাঁত। শান্তস্বরে জবাব দিল পিটার। শুনে আমার আর কিছু জিগ্যেস করতে সাহস হল না।

এরপর সেই পিণ্ডতিনটির সামনে দক্ষিণমুখী হয়ে বসে, অদ্ভুত সুরে সাঁওতালি মন্ত্র আওড়াতে লাগল পিটার। মাঝে-মাঝে হাতের মুদ্রায় বিচিত্র সব ভঙ্গি করতে লাগলো। আমি আড়চোখে মহুয়ার দিকে তাকালাম। কোনও চেঞ্জ দেখলাম না।

এমন সময় দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ গেল। রাত দুটো।

ফিসফিস করে বলে উঠল পিটার, এইবার শুরু হবে।

আর বলার সঙ্গে সঙ্গে বোবা গলায় একটা আর্তনাদ করে উঠল মহুয়া। তাকিয়ে দেখি চোখ দুটো খুলে গেছে ওর, চোখের সাদা অংশটা গাঢ় হলদে হয়ে আছে, মণিদুটো হয়ে এসেছে অনেক ছোট।

আমি দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। আর ধরতেই যেন একটা ইলেকট্রিক শক খেলাম। বাপ রে বাপ, তখন দেখি ওর গায়ে কোথা থেকে যেন দৈত্যের শক্তি ভর করেছে। ওই রুগ্ন অসুস্থ শরীরে এত আসুরিক গায়ের জোর কোথা থেকে যে এলো তা কে জানে! সারা বিছানা যেন উথালপাতাল হয়ে যেতে লাগল সেই অজানা আক্রোশে। বড় বড় চোখে, সম্পূর্ণ উন্মাদের মতো গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে সে কী তাণ্ডব, বাধা পেয়ে শেষে আমাকে এলোপাথাড়ি চড় থাপ্পড় মারতে শুরু করল মেয়েটা।

পিটার হেমব্রম, বেদিয়াদের শেষ প্রতিনিধি কিন্তু তখন অবিচল! ক্রমেই তার মন্ত্র আরও উচ্চকিত হয়ে উঠতে লাগল।

এদিকে সে যে কী উস্তমকুস্তম লড়াই চলতে লাগল আমাদের মধ্যে সে বলে আর তোদের বোর করব না। অবশ্য লড়াই বলা ভুল। একতরফা ভাবে মার খেয়ে গেলাম। আঁচড়ে কামড়ে, লাথি চড় কিল ঘুষি মেরে আমাকে যেন খুনই করে ফেলবে মেয়েটা।

এত কিছুর মধ্যে শুধু এইটা একবার খেয়াল করলাম যে ওর শ্বদন্তদুটো হঠাৎ করেই একটু বড় দেখাচ্ছে যেন!

এদিকে পিটার সেই সাঁওতালি ভাষায়, অদ্ভুত সুরেলা গলায় মন্ত্র আউড়েই যাচ্ছে। থেকে থেকে উঁচু হচ্ছে তার গলার স্বর। নিজের আসন থেকে একটুও নড়েনি সে, বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়নি একবারও।

এরই মধ্যে একবার নেতিয়ে পড়ল মহুয়া। অনেক কষ্টে সেই শীর্ণ শরীরটাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গভীর শ্বাস ছাড়লাম আমি। তারপর দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ গেল।

রাত তিনটে।

আর ঘণ্টা দেড়েকের ব্যাপার। যদি কোনওক্রমে কাটিয়ে দিতে পারি...

এবার চোখ গেল পিটারের দিকে। অর্ধেক খাওয়ানো ওষুধের গ্লাসটা টেনে নিল সে। আর মন্ত্র বলতে বলতে মুরগির কাটা মাথাটা তুলে চিপে চিপে ঠিক একফোঁটা রক্ত ফেলল সেই মিশ্রণে। এবার ঘরের কোনায় একটা হামানদিস্তা টেনে নিল, আর সেই কালকেউটের বিষদাঁতটা তার মধ্যে ফেলে দিয়ে আরও কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে গুঁড়ো করতে লাগল সেই দাঁতটাকে। মিনিটখানেক পর সেই গুঁড়োগুলো গ্লাসের মধ্যে ফেলে গ্লাসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ইশারায় বলল, খাইয়ে দাও।

কাঁপা-কাঁপা হাতে গ্লাসটা হাতে নিলাম, আর আগের মতোই দাঁতের পাটির মধ্যে চামচ ঢুকিয়ে কালকেউটের বিষদাঁত শুদ্ধু সেই ওষুধটা ঢেলে দিলাম মহুয়ার গলায়। ওঁক করে একটা আওয়াজ তুলে সেটা খেয়েও নিল মেয়েটা।

কেটে গেল আরও মিনিট কুড়ি।

রাত সাড়ে তিনটে। আর আধ ঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

আমি তাকিয়ে ছিলাম পিটারের দিকে। দেখি শিরদাঁড়া টানটান করে উঠে বসেছে ছেলেটা। তীক্ষ্ন চোখে তাকিয়ে আছে মহুয়ার বিধ্বস্ত শরীরের দিকে। আমার দিকে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকাল সে, আর দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কী যেন একটা মনে মনে ক্যালকুলেট করে নিল। তারপর ফিসফিস করে বলল, এইবার, শেষ কামড়।

অথচ আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু খেয়াল করলাম যে মৌয়ের মুখ থেকে নীলচে সবুজ গ্যাঁজলা উঠতে শুরু করেছে, ওই শীতের রাতেও কপাল থেকে দরদরিয়ে নামছে ঘামের স্রোত। মুখটা অদ্ভুতভাবে লম্বাটে হয়ে গেছে, ক্রমশ কালো হয়ে উঠছে চামড়ার রং। তার ওপর শেষসময় উপস্থিত হলে মানুষ যেমন লম্বা লম্বা শ্বাস নেয়, সেইরকম শ্বাস নিচ্ছে মেয়েটা।

আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে এল, বুঝলি? বুঝতে পারলাম শেষ অবস্থা শুরু হয়েছে মেয়েটার, আর হয়তো কয়েকটা মিনিট। হাত নাড়াতে গিয়ে বুঝলাম যে আমার হাতেপায়ে আর সাড় নেই...

এমন সময় হঠাৎ চোখ খুলে চাইল মহুয়া। সিলিং এর দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর অল্প ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে হাসিমুখে তাকাল। আমি তো অবাক! একটু আগে দুজনের মধ্যে যে কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে তার চিহ্নমাত্র নেই। এক্কেবারে স্বাভাবিক চোখ-মুখ, মুখে মৃদু হাসির ছোঁয়া, মানে যেমন ওকে সচরাচর দেখা যায় আর কি। যেন আমাদের চিরচেনা সেই মহুয়া, এইমাত্র ঘুম থেকে উঠল। একটু পর আড়মোড়া ভেঙে উঠে, মুখহাত ধুয়ে, সেজেগুজে আমার সঙ্গে অষ্টমীতে পুজোর অঞ্জলি দিতে যাবে।

শুয়ে শুয়েই মহুয়া আমার দিকে তাকিয়ে ভারি মিষ্টিভাবে হাসল একবার। আর তারপরই স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো চকিতে কোমর ভাঁজ করে, শরীরের ঊর্ধ্বাংশটা তুলে এনে আমার বাঁ-কাঁধটা দাঁত দিয়ে সজোরে কামড়ে ধরল ও, বাঁ-হাত দিয়ে চেপে ধরল আমার টুঁটি!

ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে বুঝতে বুঝতেই আমার সময় লাগল খানিকটা। তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে ওকে যখন ঝটকা দিয়ে ফেলে দিয়েছি, তখনই মনে হচ্ছে আমার কাঁধের খানিকটা কে যেন খুবলে নিয়েছে। জ্বলন্ত শিক ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো যন্ত্রণায় আমার বাঁ-দিকটা পুরো অসাড় হয়ে এল।

তারপর একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত ভৌতিক ক্যারক্যারে পুরুষালি গলায় হি-হি হি করে হেসে উঠল মেয়েটা। তারপর তার সঙ্গে দুলে দুলে হাততালি দিতে লাগল।

গলাটা শুনে আমার ঘাড়ের সমস্ত রোম দাঁড়িয়ে গেল, বুঝলি! রাতবিরেতে চেনাজানা কোনও মেয়ের মুখে ছেলের গলায় ভূতুড়ে স্বরে খিলখিল হাসি শুনলে ভয় লাগারই কথা। কিন্তু আমার ভয় লাগার আরও একটা অন্য কারণ ছিল।

ব্ল্যাকবোর্ডের ওপরে নখের আঁচড় কাটার শব্দের মতো এই গলাটা আমার চেনা।

এ গলার স্বর আমি আগেও শুনেছি।

কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায়। মাস দেড়েক আগে।

এটা সেই লোকটার গলা। সেই ছাইয়ের মানুষ!

পিটারের দিকে তাকিয়ে দেখি চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কী যেন উচ্চারণ করে চলেছে সে। এই শীতের রাত্রেও ঘামে ভিজে গেছে তার জামা। এদিকে মহুয়া সেই ভূতুড়ে গলায় খলখল স্বরে হাসতে হাসতে ঘরের বাতাসকে শিউরে তুলেছে। হাসতে হাসতেই হঠাৎ করে একবার হেঁচকি তুলল মহুয়া, আর তারপরেই চেপে ধরল নিজের গলাটা।

আমিও আঁতকে উঠলাম।

দেখলাম দীর্ঘ কালো নখগুলো দিয়ে ও আঁকড়ে ধরেছে নিজের গলা, চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। ঠিক যেন একটা ফাঁসির আসামিকে গলায় ম্যানিলা রোপ পরিয়ে সজোরে টেনে ধরেছে কেউ!

পরের দৃশ্যগুলো স্রেফ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দেখতে হল আমার। বরফের মতো ঠান্ডা হাত-পা নিয়ে দেখলাম যে মেয়েটা আঁকড়ে কামড়ে ফালাফালা করে দিচ্ছে নিজের গলা। যে অদৃশ্য পাশ সাক্ষাৎ কালসাপের মতো চেপে বসেছে ওর গলায়, সর্বস্ব পণ করে ও চেষ্টা করছে তার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে।

আমি সভয়ে সরে এলাম, আমার ক্ষমতা নেই এই অতিলৌকিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার।

এদিকে মহুয়ার অবস্থা ক্রমেই কাহিল হয়ে উঠছে। কাটা পাঁঠার মতো বিছানার ওপর পা'দুটো দাপাচ্ছে ও। মুখচোখ ফুলে নীল হয়ে এসেছে, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে। রক্তাক্ত গলাটা দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনও হিংস্র প্রাণী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো ওর ওপর। ডাইনির হাতের মতো কালো হাতদুটোর শিরা ফুলে উঠেছে। শ্বাসবন্ধ হওয়ার শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে আরও। আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে, আমি বুঝতে পারছি না কী করব...

এমন সময় দেখলাম দপ করে নীল আগুনের মতো জ্বলে উঠল মহুয়ার গলায় ঝোলানো সেই মহাশঙ্খের মালাটা। সাদা হাড়ের মধ্যে যেন বিদ্যুতের মতো খেলা করে যেতে লাগল ছোট ছোট নীল আলোর শিখা।

এক ভৌতিক আতঙ্কের সঙ্গে যুঝতে লাগল আরেক অপার্থিব অভয়শক্তি।

জানি না কতক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিলাম এই অনৈসর্গিক দৃশ্যের সামনে। একসময়ে ভেবেছিলাম বুঝি হেরেই গেলাম এই লড়াইতে। কিন্তু কিছু পরে বুঝতে পারলাম যে ধীরে হলেও আস্তে আস্তে এই যুদ্ধের ফলাফল আমাদের পক্ষে চলে আসছে। যদিও তখনও লড়ে যাচ্ছে মহুয়া, তবে বুঝতে পারছিলাম যে আস্তে আস্তে সেই অজানা ফাঁস আলগা হতে শুরু করেছে। আওয়াজ করে শ্বাস নিতে শুরু করেছে মেয়েটা। আস্তে আস্তে ছটফটানিটা কমে এল, বন্ধ হল গলা আঁচড়ানো।

তারপর একসময়ে দম শেষ হওয়া কলের পুতুলের মতো ঠাস করে বিছানার ওপর নিঃসাড়ে পড়ে গেল মেয়েটা।

ওর দিকে ছুটে যাবার আগে একবার তাকালাম পিটারের দিকে, আর ঠিক সেই সময় আমার চোখ গেল জানলায়। আর সেদিকে একবার তাকানোর পর, আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়েই ছিল ভয়ে, এরপর একেবারে অসাড় হয়ে গেল আমার দেহ।

দেখলাম যে জানলার ওপারের জমাট অন্ধকারে জানলার গ্রিল জুড়ে আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে একটা মুখ। বীভৎস ক্রুর সেই মুখাবয়বে ফুটে উঠছে এক ভয়াল আদিম জিঘাংসা। এই ভয়ঙ্কর মুখটাকে আমি চিনি, খুব চিনি। আর আজকে এও জেনেছি যে এই মুখ রক্তমাংসের কোনও মানুষের মুখ নয়। এর শরীরে বাসা বেঁধে আছে প্রাচীন বিষ, এর ধমনীতে খেলা করে বেড়ায় যন্ত্রণার আগুন, এর চৈতন্য জুড়ে শুধু প্রতিশোধের উদগ্র বাসনা। এই মরপৃথিবীর বাসিন্দা নয় ও, নরকের কোন অতল থেকে উঠে এসেছে, ও ছাইয়ের মানুষ!

খেয়াল করলাম যে সেই মুখে একটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধার দৃষ্টি। বুঝতে অসুবিধা হয় না, শিকারকে বাগে পেয়ে তাকে একটু একটু করে কাটার মধ্যে যে পৈশাচিক আনন্দ আছে, লোকটার মুখেচোখে খেলা করে বেড়াচ্ছে

সেই নারকীয় উল্লাস।

আমিও কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম লোকটার মুখের দিকে।

কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, এমন সময় একটা জিনিস খেয়াল করে একটু আশ্চর্য লাগল। মানে তখন মনের যা অবস্থা তাতে ভয় ছাড়া অন্য অনুভূতি গ্রাহ্য হবার কথা নয়, তবুও অবাক হওয়াটাকে এড়াতে পারলাম না।

এর আগে যতবারই মুখোমুখি হয়েছি লোকটার, বরাবর দেখেছি যে ওর দৃষ্টি মহুয়ার দিকে। ঈশ্বর জানেন মহুয়ার ওপর কেনই বা ওর অত রাগ, কিন্তু প্রথম থেকেই মহুয়াই ছিল ওর ধ্যানজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু।

এইবার দেখলাম, প্রথমবারের জন্যে দেখলাম, যে লোকটা কিন্তু এবার মহুয়ার দিকে তাকিয়ে নেই। তার দৃষ্টি অন্য আরেকজনের দিকে।

পিটার।

ততক্ষণে ভয়ে আতঙ্কে পাগল হয়ে যাওয়া মাথায় ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না স্বাভাবিক কারণেই। শুধু এইটা বুঝলাম, যে দৃষ্টিটাকে আমি ক্রূরের সর্বগ্রাসী লোভাতুর দৃষ্টি ভেবেছিলাম, সেটা আসলে অন্য দৃষ্টি। ওই দৃষ্টিতে ক্ষুধা থাকতে পারে, কিন্তু নিষ্ঠুরতা নেই। বরং অন্য একটা জ্বলজ্বলে আবেগ ফুটে উঠেছে সেই চোখে। সেটা প্রথমে ধরতে পারিনি, খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আমি বুঝতে পারলাম যে ওটা কীসের আবেগ।

ওটা বুভুক্ষু স্নেহাতুর হৃদয়ের দৃষ্টি। ও জিনিস মৃতপ্রায় শিকারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শিকারির চোখে মানায় না।

আমার সামান্য বাঁ-দিকে পিটার বসে আছে চোখ বন্ধ করে। আর আমার ডাইনে জানালার বাইরে সেই লোকটার মুখ। সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে দুজনকেই আমার নজরবন্দি করতে পারছি। দুদিকেই বেশ কিছুক্ষণ, মিনিটখানেকও হতে পারে, ঠিক বলতে পারবো না, তাকিয়ে থাকার পর একটা অবিশ্বাস্য জিনিস আমার নজরে এল। বারবার দেখছি ব্যাপারটা, বিশ্বাস করতে আমার মন চাইছে না। অথচ সেটা এতই জলজ্যান্ত হয়ে ফুটে উঠেছে যে নোবডি ক্যান মিস দ্যাট!'

'অ্যান্ড হোয়াটস ওয়াজ দ্যাট?' আমার ভূতপ্রেতে ঘোর অবিশ্বাসী বাবা জিগ্যেস করলেন ফিসফিস করে। আমরা বাকিরা তখন পটের ছবিটির মতো স্পেলবাউন্ড হয়ে বসে আছি। আমাদের সবার মুখের ওপর একঝলক তাকিয়ে নিলেন দীপুপিসি। তারপর গলাটা খাটো করে বললেন, 'দেখলাম যে পিটার আর লোকটাকে হুবহু একইরকম দেখতে। হুবহু মানে হুবহু, এক্কেবারে কার্বন কপি বললেই চলে। শুধু লোকটার মুখে নোংরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আর পিটার এক্কেবারে ক্লিন শেভড। এছাড়া দুজনের মুখের মধ্যে এতটাই মিল, যেটা অনাত্মীয় দুজন মানুষের মধ্যে হওয়া কার্যত অসম্ভব! চট করে দেখলে মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, এদের মধ্যে কোনও না কোনও সম্বন্ধ আছেই, মানে কোনও না কোনও রক্তের সম্বন্ধ...রক্তের সম্বন্ধ...রক্তের... রক্ত...

একটা কথা আমার নিঃসাড় মগজে যেন বিদ্যুতের চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল।

ভৈরবীমা বলেছিলেন না, এই বিষের প্রতিষেধক শুধু সেই ছাইয়ের মানুষের রক্ত? সে কী রক্তের ফোঁটা দিয়ে তৈরি ওষুধ? নাকি অন্য কিছু?

রক্ত বলতে বংশধারাও বোঝায় না?

কথাটা ভাবতে যে কয়েকমুহূর্ত লাগল, তার মধ্যেই আমার মগজে গেঁথে গেল কথাটা, আমার সামনে যে ছেলেটা বসে আছে সে শুধু পিটার নয়, আসলে সে এই ছাইয়ের মানুষের উত্তরপুরুষ! তারই রক্ত বইছে এই পিটার হেমব্রমের দেহে। কোনও ওষুধ নয়, পিটারই আসলে এই মহৌষধের অন্যতম উপাদান। একমাত্র তার হাতে বানানো মাসানকাটাই নিরস্ত করতে পারে এই মহাশাপের বিষ।

অর্থাৎ ভৈরবীমায়ের কথাই সত্যি হল, যার অভিশাপে আজ মহুয়ার এই অবস্থা, তারই রক্ত এসে দাঁড়িয়েছে প্রতিষেধক হিসেবে। অব্যর্থতম মৃত্যুবাণের সামনে অভেদ্যতম বর্ম!

আবার তাকালাম জানলার দিকে। কেউ নেই। কিচ্ছু নেই।

দিগন্তে তখন ভোরের ক্ষীণ লালচে আভা। দিন শুরু হতে চলেছে প্রায়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিছানা থেকে একটা ক্লান্ত মৃদু আওয়াজ কানে আসায় ঘুরে বসলাম আমি। দেখি চোখ খুলে উঠে বসার চেষ্টা করছে মহুয়া, আমাকে দেখে প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় বলল, 'শরীরটা খুব খারাপ লাগছে রে। কিছু খেতে দিবি?

এবারের মতো শেষবারের জন্যে ওকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম আমি।'

গল্প শেষ করে চুপ করে বসেছিলেন দীপুপিসি। আমরাও নির্বাক। শুধু অরিজিৎ একবার জিজ্ঞাসা করল, 'ওই মহাশঙ্খের মালা তোমার কাছে আছে এখনও?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন দীপুপিসি।

'পরের দিন আমরা ভৈরবীমায়ের থানে গিয়ে দেখি যে গুহা বেবাক ফাঁকা, বাঘছালটা ছাড়া সবই ফেলে গেছেন। সন্ন্যাসী মানুষ, হয়তো অন্য কোথাও গিয়ে ডেরাডাণ্ডা বেঁধেছেন। দেখে বুধনদা, মংলাদা, রেংতো, সবাই খুব আফশোস করছিল। আমি ওদের চোখ এড়িয়ে সেই গুহার মধ্যেই মালাটা রেখে আসি, ও জিনিস কাছে রাখার সাহস ছিল না আমার।

সেইদিনই বিকেলের ট্রেনে কলকাতা নিয়ে আসি মহুয়াকে। পাক্কা আড়াইমাস ভুগেছিল মেয়েটা। সেরে ওঠার পর সেই হাসিখুশি মহুয়াকে আবার ফিরে পেয়েছিলাম বটে, তবে একটা অভ্যাস চিরতরে ছেড়ে গেছিলো ওর। যেখানে সেখানে ফুচকা আর ঘুগনি খাওয়ার অভ্যেসটা।'

জঙ্গলের ধারে একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়েছিল লোকটা। ভোরের বাতাসে সামান্য কাঁপছিল তার দেহ। সামনে ক্ষীণতোয়া কাঁসাই নদীর বুকে লেগেছে পূব দিগন্তে সদ্য জেগে ওঠা অল্প লাল আভার রং। সেইদিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিল সে।

ব্যর্থ হয়েছে সে। তার দেওয়া অব্যর্থ অভিশাপ-বিষ আজ ব্যর্থ হয়ে গেছে, সত্যি হয়েছে ডানবুড়িদের কথাই। তারই রক্ত এসে আজ নিষ্ফল করে দিয়েছে তার এতদিনের জমিয়ে রাখা ক্রোধ, ধুলোয় মিশে গেছে তার উগরে দেওয়া ঘৃণা। যার জন্যে দেড়শো বছর ধরে এই ছাইয়ের দেহ নিয়ে, বুকে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে সে। আজ আর তার কোনও মূল্য নেই, ব্যর্থ তার এতদিনের প্রেতদেহ ধারণ, ব্যর্থ তার সমস্ত সাধন।

কিন্তু কই, তবু তার বুকে ঝলসে ওঠে কই ব্যর্থতার তীব্র জ্বালা? তার চোখে আজ এত জল কেন? এই ছাইয়ের মানুষের চোখে এত জল আসে কোথা থেকে? কই তার বুকের মধ্যে দেড়শো বছর ধরে জ্বালিয়ে রাখা প্রতিশোধের আগুন? সেখানে আজ কেন থই-থই করে অযোধ্যা পাহাড়ের শতঝরনার জল? এত ভালোবাসা কোথা থেকে জুড়ে বসল তার অলৌকিক শরীরে? এত মায়া কী করে বাসা বাঁধে তার অন্ধ দু'চোখের কোটরে?

আকাশের দিকে দুটো হাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে তুলে ধরে সে, ঠাকুর শুনেছিলেন তার কথা। রূপাই মরে নাই, মরে নাই। বেঁচে ছিল, বেঁচে ছিল তার কলজেছেঁড়া ধন। আজ নিজের চোখে দেখে এসেছে সে, দু'চোখ ভরে দেখে এসেছে তার রক্তের উত্তরাধিকারীকে। আহা একটিবার যদি তার মুখখানি ধরে চুমো খেতে পারত সে। আয় রে আমার রূপাই, আয় রে আমার লখাই...তোরা আয় আয় আয়...

নিভে যাওয়া অন্ধ চোখ থেকে নোনতা জল বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দেয় সেই ছাইপোড়া বুক। আহ, বুকের মধ্যিখানে বড় ঠান্ডা, বড় শীতল লাগে তার। দু-হাত তুলে প্রার্থনা করে সে, হো ঠাকুর, আমারে্য রূপাইয়ের

কোল্যে ফির‍্যে দাও ঠাকুর, গোড় লাগি তর প্যাঁয়্যে।

আস্তে আস্তে তার মাথা থেকে উড়ে যেতে থাকে সেই ছাইয়ের কণা, প্রথমে ধীরে, তারপর দ্রুত। ভোরের আকাশে উড়ে যেতে থাকে তার ক্রোধ আর অভিমান, উড়ে যেতে থাকে তার পাপ ও পুণ্য, উড়ে যেতে থাকে তার ক্ষোভ আর ঘৃণা।

দাঁড়িয়ে থাকে লোকটা, আর আস্তে আস্তে জঙ্গলের মানুষের দেহের শেষ কণাটুকু মিশে যায় জঙ্গলের শীতল বাতাসে, মিশে যায় অগণন নক্ষত্রমালায়, মিশে যায় অনন্ত নীহারিকাপুঞ্জে।

ভোরের শীতল বাতাসে কে যেন ফিসফিস করে বলে যায়, বুকে বড় মায়া হে, বড় মায়া!



খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ

ঠিক সন্ধেটা লাগার মুখে গ্রামের খোঁড়াভৈরবী মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন মুখুজ্জে বাড়ির বাসন্তীপিসি। পিসির বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, স্বামী সন্তান নিয়ে সুখের সংসার। পৃথুল ও মেদবহুল মুখে ঘামতেলের মতো একটা আলগা তৃপ্তির জেল্লা সবসময়ই লেগে থাকে। নিত্যই মায়ের থানে পুজো দিতে আসেন তিনি, শনি আর মঙ্গলবারে ঘটাটা একটু বেশিই হয়। তা হয় হোক, এই ভৈরবীমায়ের কৃপাতেই তো গঞ্জের বাজারে এত বড় চালকল আর দু'দুখানা অয়েলমিল চলছে ওদের।

কর্তা কাজকম্ম থেকে অবসর নিয়েছেন বছরখানেক হল, এখন সবকিছু ছেলে নিতাই সামলায়। চালাকচতুর ছেলে নিতাই, এই তো মাস খানেক হল তার বিয়েও দিয়েছেন পিসি, মেয়ে বর্ধমানের, পালটি ঘর। ভারি লক্ষ্মীমন্ত বউমা পেয়েছেন বাসন্তীপিসি। সেদিন তো সামন্তগিন্নি গ্রামের গিন্নিদের মজলিশে সবার সামনে বলেই দিলেন, 'মুখুজ্জেগিন্নির কপাল আছে গো, ভারি ভাগ্যি করে বউ পেয়েছে। ডিগ্রিপাশ হলে কী হবে, বউয়ের স্বভাবচরিত্তির যেমন ঠান্ডা, তেমন কাজকর্মেও ভারি চটপটে,' শুনে বুকে বাতাস লেগেছিল বাসন্তীপিসির। আহা, সুখ যেন ভিয়েনে বসানো কড়াইয়ের দুধের মতো উথলে উথলে পড়ছে। দু-হাত জড়ো করে নমো করলেন বাসন্তীপিসি, 'মা মাগো, রক্ষে করো মা। তুমিই সব।'

আজ পূর্ণিমা, আকাশজুড়ে মস্ত বোগিথালার মতো চাঁদ উঠেছে। হেমন্তের বাতাসে বেশ শিরশির একটা ভাব। গ্রামের শেষে যোগেন চাকলাদারের বাড়ি, তারপরেই কালীর মাঠ, আর মাঠের পাশেই ভুষুণ্ডিকাকের আমলের বড় বটগাছটার নীচে এই ভৈরবকালীর মন্দির। তালদিঘির ভৈরবীকালীর সুনাম আছে ভারি জাগ্রত দেবী বলে, দূরদূরান্ত থেকে লোকে পুজো দিতে আসে। আর আসবে নাই বা কেন? এই মন্দির নিয়ে বেশ ভয়ধরানো কাহিনিও আছে যে একটা।

লোকে বলে এ মন্দির নাকি তিনশো বছরের ওপর পুরোনো, মুর্শিদকুলি খাঁয়ের খাজাঞ্চি রায়রায়ান রামভূষণ দে সরকারের আদেশে বানানো। কামাখ্যা থেকে বিখ্যাত অঘোরী সাধক কালীগিরি তান্ত্রিককে আনা হয়েছিল মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য।

প্রতিষ্ঠার দিন সরকার মশাইয়ের এক বিশ্বস্ত প্রজার অসাবধানতায় মায়ের ডানপায়ের বুড়ো আঙুলটা ভেঙে যায়। প্রবল প্রতাপশালী রায়রায়ান সে হতভাগাকে কাটতেই চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু হাতের কাছে চটজলদি একটা তলোয়ার বা সড়কি খুঁজে না পেয়ে শেষমেশ অনিচ্ছার সঙ্গেই সেই প্রজাকে সড়ালে কুত্তা দিয়ে খাওয়ানোর বিধান দেন।

কিন্তু তাতে বাধ সাধেন কালীগিরি তান্ত্রিক স্বয়ং। তাতে রামভূষণ বেজায় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, সচরাচর তিনি এসব ক্ষেত্রে জ্যান্ত পুঁতে দিয়ে থাকেন, কুত্তা দিয়ে খাওয়ালে কষ্টটা কিছু কম হত বলেই তাঁর ধারণা। তাছাড়া অবোলা প্রাণীগুলো পেটপুরে খেতেও পারত, সে পুণ্যটার কথাও না ভাবলে চলবে কেন? তবে তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে, খুঁতো মূর্তি নাকি পুজো দিতে নেই, এই নিয়ে কিছু গাঁইগুঁই করছিলেন দে সরকার মশাই। অট্টহাসিতে সে আপত্তি উড়িয়ে দেন কালীগিরি তান্ত্রিক, 'কাল তোর মেয়ের পায়ের একটা আঙুল কাটা পড়লে তাকে ফেলে দিয়ে নতুন মেয়ে আনতি নাকি রে?' প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। 'মূর্তি তো শুধু সাধন ভজনের সুবিধা হবে বলে রে পাগল, যে বেটির পায়ের তলায় স্বয়ং মহাকাল শুয়ে আছেন তার কী এসে যায় রে এই সবে?'

'কিন্তু গুরুদেব...,' চিন্তিত প্রশ্ন তুলেছিলেন রামভূষণ, 'এতে করে যদি সেবায়েত বা গ্রামের অমঙ্গল হয়?'

কথাটা কালীগিরি তান্ত্রিককে ভাবিয়েছিল ঠিকই। তা নইলে তিনি সেই রাতেই শ্মশান থেকে এক চণ্ডালের শব এনে তন্ত্রমতে শবসাধনায় বসবেন কেন?

কালীগিরি তান্ত্রিক শ্মশানসিদ্ধাই ছিলেন, ভোর হওয়ার আগেই লোকচক্ষুর অগোচরে সেই চণ্ডালের দুটি হাতের আর দুটি পায়ের হাড় দিয়ে মন্দির আর গ্রামের চৌদিক ঘিরে ভূমিবন্ধন করে যান তিনি। সেই থেকেই তালদিঘির কালীঠাকুর খোঁড়াভৈরবী বলেই এদিগরে প্রসিদ্ধ। তালদিঘি গ্রামের লোকে জানে যদ্দিন

ভৈরবী মা আছেন, তদ্দিন মায়ের আশীর্বাদে তালদিঘির ওপর বড় কোনও অপঘাত আসতে পারে না। এক যদি না...

ভারী মন দিয়ে পুজো দিচ্ছিলেন বাসন্তীপিসি, ভক্তিতে মনটা ভরে উঠছিল তাঁর। এরকমই রসেবশে রেখো মা, এরকমই রেখো। হাত জড়ো করে মাথায় ঠেকিয়ে বিড়বিড় করছিলেন তিনি, সবই তো হল মা, এবার একটা কোলজোড়া নাতি দিও, যাওয়ার আগে যেন বংশের প্রদীপ দেখে যেতে পারি। সামনের কালীপুজোয় সোনার নথই মানত করে ফেলেন তিনি। জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী...ইত্যাদি বলে টলে আরতি করার সময় প্রদীপটা যেই না ভৈরবীমূর্তির মুখের সামনে এনেছেন, সেদিকে একঝলক তাকিয়েই মুহূর্তখানিক স্তম্ভিত হয়ে রইলেন তিনি, আর তারপরই আঁ-আঁ আওয়াজ তুলে দড়াম করে পড়ে মূর্ছা গেলেন গাঁয়ের মুখুজ্জে বাড়ির দাপুটে গিন্নি বাসন্তীরানি মুখুজ্জে।

মন্দিরের সেবাইত যোগেন ভশ্চাজ্যি মশাই তখন মন্দিরের বাইরে লাল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো তেলতেলে রোয়াকে বসে পুজো দিতে আসা আরও জনাকয়েক পুরুষ ও মহিলাকে কৌশিকী অমাবস্যায় মহাভৈরবীকালী পুজোর মাহাত্ম্য বোঝাচ্ছিলেন। অন্তত চারটে পুজো বা যজ্ঞ পাকড়াও করে ফেলেছিলেন প্রায়, মাস দুয়েকের জন্যে বাংলা আর চাটের বন্দোবস্ত হাতে আসি আসি করছে প্রায়, তার মধ্যেই এই!

মন্দিরের ভেতরে ছুটে যেতে দেরি হয়নি কারোরই। লোকে প্রথমে ভেবেছিল মুখুজ্জেগিন্নির ফিটের ব্যামোটা বোধহয় ফিরে এসেছে। কিন্তু গ্রামের মহিলারা যখন মুখুজ্জেগিন্নির বিশাল শরীরখানি ঘিরে জলের ছিটে আর হাওয়া দিতে ব্যস্ত, তখন যোগেন ভশ্চায্যি কাঁপতে কাঁপতে ভৈরবীমূর্তির দিকে ডান হাতের তর্জনী তুলে, 'এ কী, এ কী করে হল! এ যে মহা সর্বনাশ, মায়ের কোপদৃষ্টি জেগেছে রে!' বলে দড়াম করে পড়ে যেতে লোকজনের মনে হয় যে ব্যাপারটা অন্যকিছু হলেও হতে পারে।

তখন সমবেত লোকেদের নজর ঘুরে যায় মূর্তির দিকে। আর তারপরেই লোকজন ভয়ে আর আতঙ্কে একেবারে কাঠ হয়ে যায়।

সেই রাতেই প্রবল ঝড় ধেয়ে আসে তালদিঘির ওপরে আর খোঁড়াভৈরবীর মাঠের উত্তরদিকের প্রাচীন বটগাছটা উপড়ে পড়ে যায়। কেউ যদি সেই গাছের গুঁড়ির দিকের মাটি আর শিকড় সরিয়ে দেখত, একটা ঝুরঝুরে উরুর হাড় তার নজর এড়াতো না নিশ্চয়ই!

গ্রামে ঢোকার সময়েই একটা কিছু টের পাচ্ছিল দনু, ওরফে দনুজদমন সেনাপতি। হপ্তা দুয়েক হল এখানেই তালদিঘি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যায়তনের সায়েন্সের টিচার হিসেবে জয়েন করেছে সে।

কলকাতা শহর ছেড়ে এই গণ্ডগ্রামের দিকে চাকরি করতে আসার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না দনুর। এসএসসি-র পরীক্ষাটা দিয়ে এদিকওদিক প্রাইভেট কম্পানিগুলোতে চাকরির চেষ্টাই করছিল সে। কিন্তু দু-একটা ইন্টারভিউ দিয়ে দনু দ্রুতই বুঝে যায় যে, চাকরির বাজারের হাল সে যতটা ভেবেছিল তার থেকেও খারাপ, খুব খারাপ। বউদিও এদিকে ঠারেঠোরে ঈঙ্গিত দিচ্ছিল যে দাদার সংসারে বেশিদিন গলগ্রহ হয়ে থাকলে এখনও যে ডিমটা, দুধটা জুটছে সেটা ভবিষ্যতে নাও জুটতে পারে।

ফলে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো এই স্কুলমাস্টারির চাকরিটা পেয়ে আর দুবার ভাবেনি দনু। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে নিয়ে সে একপ্রকার স্টেশনে এসে রেলগাড়ি চেপে বসে বললেই চলে। গ্রামের একদম কোনায় সস্তায় একটা বাড়ি ভাড়াও স্কুলের পক্ষ থেকেই ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল তাকে।

গত দুদিন গ্রামে ছিল না দনু, সপ্তাহান্তের ছুটিতে কলকাতা গেছিল দাদা বউদির সঙ্গে দেখা করতে, আর টুকটাক কিছু কেনাকাটা করতে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মেরে দৌড়ঝাঁপ করে শেষ পর্যন্ত সে যখন স্টেশনে পৌঁছয় তখন আটটা চল্লিশের লোকাল দিয়েছে ছেড়ে। ফলে সে লাস্ট ট্রেনটাই ধরতে বাধ্য হয়।

স্টেশন থেকে টোটো ধরেছে দনু, বরাবরই যেমন ধরে। সারা স্টেশন চত্বর ফাঁকা দেখেও তেমন কিছু মনে হয়নি, কিন্তু টোটোটা যখন ভেতরে ঢোকার বদলে গ্রামের বাইরেই তাকে নামিয়ে দিল তখনই খটকা'টা লাগে তার।

'কী রে, ভেতরে যাবি না?' বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করেছিল দনু।

'না বাবু,' চাপা স্বরে জবাব দেয় মফিজুল, 'এখন রেতের বেলা গাঁয়ে ঢুকতে পারবুনি। আব্বু মানা করে দেছে।'

'কেন রে?' আরও অবাক হয়েছিল দনু, 'আগের হপ্তাতেই তো বাড়ি অবধি ছেড়ে দিয়ে এসেছিস, আজ কী হল?'

'সেসব বলতে পারবুনি বাবু, বলা বারণ। অ্যাই তো একটুখান রাস্তা, হাঁটি চইল্যে যান না কেন। টর্চ আনিছেন?'

বিরক্ত হয়েছিল দনু, 'টর্চ আনব কেন? আগে যদি জানতাম আজ এসব ফালতু বাহানা মারবি তাহলে ব্যবস্থা করতাম। যত্তসব', বলে হাঁটা দিতে যাচ্ছিল দনু, এমন সময় মফিজুল একখানা ছোট টর্চ হাতে ধরিয়ে দেয় ওর। 'বাড়ির ভিতরি ঢুকবার আগতক টর্চ খান নেভাবেন না বাবু, আর পেছন বাগ থিকে কেউ ডাকলে খবদ্দার ফিরে তাকাইয়েন না কিন্তুক। আল্লার নাম, থুড়ি রামের নাম নিতে নিতে চইল্যে যাবেন। টর্চ খান কাল বাজার করতি আসবেন যখন, তখন সাধনের মুদিখানায় দিয়্যা দিয়েন।' বলে আর দাঁড়ায় না মফিজুল। টোটোখানা ঘুরিয়ে সেখান থেকে প্রায় পালিয়েই যায় যেন।

রাস্তা দিয়ে আসতে আসতেই একটা পচা আঁশটে গন্ধ টের পাচ্ছিল দনু, তার সঙ্গে পাথরচাপা নৈঃশব্দ। গ্রামের রাস্তা এমনিতেই একটু নির্জন থাকে, তার ওপর শীতের রাত। কিন্তু তা সত্ত্বেও চারিদিক এত চুপচাপ কখনও দেখেনি সে। রোজই রাতে খাওয়া দাওয়ার পর একটু হাঁটতে বেরোয় দনু। তখন হাটফেরতা চাষিদের দল থাকে রাস্তায়, থাকে সাইকেলের সামনের রডে মেয়ে বসিয়ে ঘুরতে বেরোনো বখাটে ছোঁড়াদের দল। এছাড়াও শহর থেকে রাতের ট্রেনে আসা অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়ে যায় তার।

আজ তবে সবকিছু এত চুপচাপ কেন?

দুদিন আগেই পূর্ণিমা গেছে। আকাশে দ্বিতীয়ার চাঁদ, অল্প একটু মেঘও করেছে। আবছা আলোছায়ায় সামনে পড়ে থাকা কালো ফিতের মতো সরু রাস্তাটাকে সাপের খোলসের মতো লাগছিলো দনুর। যেখানে টোটো তাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে সেখান থেকে তার বাড়ি বেশ খানিকটা রাস্তা। যেতে যেতে খেয়াল করে সে, চারিপাশে একটুও শব্দ নেই কোথাও, মানুষজন বা নেড়ি কুকুর কারও পাত্তা নেই, এমনকী গাছের পাতা অবধি নড়ছে না! শুধু চারদিকে আলগা অভিশাপের মতো লেগে আছে কটু আঁশটে গন্ধটা। আরও কী যেন একটা নেই, ভাবছিলো দনু, তাই এত অস্বস্তি হচ্ছে আজ। একটু পরে সেটা খেয়াল করতে তার হাঁটাটা আস্তে হয়ে এল।

ঝিঁঝির ডাক। একটা ঝিঁঝিপোকাও ডাকছে না আজ।

গ্রামে আসা ইস্তক এই দুই সপ্তাহে এমন একটা রাতও যায়নি যখন এই বিপুল শব্দ ব্রহ্মতালা লাগায়নি তার কানে। আজকাল তার অনেকটা অভ্যেস হয়ে গেছে শব্দটা, তাই এই চুপচাপ থাকাটা কেমন যেন অশরীরী লাগল তার। দনুর মনে হচ্ছিল এই চুপজোছনার রাত যেন ভারী পাথরের মতো তার বুকে চেপে বসেছে।

শীতের রাতেও একটু ঘেমে উঠছিল দনু, হাঁটার বেগটা বাড়িয়ে দিল সে। সামনের তেমাথার মোড় থেকে একটা রাস্তা বেঁকে গেছে ডানদিকে। সেই রাস্তা দিয়ে একটু এগোলেই গ্রামের পাশের বড় বাঁশবনটা। তার গা দিয়ে একটা শর্টকাট আছে দনুর বাড়ির দিকে যাওয়ার। রাস্তাটা খোঁড়াভৈরবীর মাঠের ধার ঘেঁষে। সেই রাস্তাটাই ধরল দনু, তাড়াতাড়ি হবে। আর এক মুহূর্তও খোলা জায়গায় থাকতে চাইছিল না সে।

বাঁশবনের মাঝামাঝি যেই এসেছে সে, সেই পচাটে গন্ধটা যেন হঠাৎ করে বেড়ে উঠে একঝলক দমকা হাওয়ার মতোই ঝাপটে গেল তার চোখেমুখে। প্যান্টের পকেট থেকে রুমালটা বার করে নাকে দিতে যাবে দনু, এমন সময় বাঁদিকে কী যেন একটা আওয়াজ শুনতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে।

ঝোপের আড়ালে কী ওটা? ওই যে নড়াচড়া করছে? মাথা নীচু করে হাতের পাতাটা কপালের ওপর ধরে ঠাহর করার চেষ্টা করল সে, মুরলীদের বাড়ির কেলে গাইটা না? এখানে বসে আছে কেন এত রাতে? গোয়ালে নিয়ে যায়নি কেউ?

রাস্তা ছেড়ে সন্তর্পণে বাঁশবাগানে ঢুকল দনু, বুকটা দুরুদুরু করছিল তার। একটু এগিয়েও থমকে গেল সে।

কারণ সে স্পষ্ট দেখতে পেল যে গরুটা আসলে বসে নেই, শুয়ে আছে। আর যেভাবে ঘাড় কাত করে শুয়ে আছে তাতে বোঝা যায় যে তার গলাটা মুচড়ে দিয়েছে কেউ। একটা হাড় চিবোনোর মড়মড় আওয়াজ কানে এল নাকি তার?

আর মরা গরুটার পাশে কালো ছায়ার মতো কে ওটা? জ্বলজ্বলে চোখ?

ঠিক এই সময়েই মেঘ সরে গিয়ে একটুকরো চাঁদের আলো যেন বজ্রপাতের মতোই আছড়ে পড়ল তার গায়ে।

তারপর আর কিছু মনে নেই দনুর।

বাথরুমে ঢুকে বেসিন ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল শামু, মানে এ বাড়ির নতুন বউ শাম্ভবী। বাথরুমে বউয়ের জন্যে একটা বাহারি ওয়াশ বেসিন বসিয়ে দিয়েছে নিতাই, তার ওপরে একটা ছোট আয়নাও লাগিয়ে দিয়েছে। ঝটপট মুখেচোখে জল দিয়ে উত্তেজনাটা কমাবার চেষ্টা করছিল শামু। হাতে লেগে থাকা শাশুড়ি মায়ের রক্তটা শুধু একবার জিভের ডগায় ঠেকায় সে, আহ, কী স্বাদ!

বাথরুমের বাইরে থেকে দরজায় টোকা দেয় পিসতুতো ননদ শ্যামলী, 'ও বৌদি, একবারটি এসো না। ডাক্তারবাবু কী সব বলবেন বলে ডাকছেন তোমাকে।' শুনেই যতদূর সম্ভব গলার স্বর স্বাভাবিক করে ফেলে শামু, তারপর উত্তর দেয়, 'যাই।' দ্রুত গামছা দিয়ে মুখটা মুছে ফেলে সে।

বাসন্তীপিসি চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে ছিলেন বিছানায়। মাথায় মস্ত বড় ব্যান্ডেজ, পড়ে গিয়ে অনেকটা কেটে গেছে মাথায়। পাশে ভিড় করে আছেন গ্রামের ছোটবড় গিন্নিদের দল।

ডাক্তারবাবু গম্ভীরমুখে প্রেশার মাপছিলেন বাসন্তীপিসির। আশেপাশের মহিলাদের মুখে উদ্বেগ ছাপিয়েও যেটা ফুটে উঠছিল সেটার নাম ভয়, হাড় কাঁপানো ভয়!

'সত্যি দেখেছিস তুই?' সামন্তদের বড় গিন্নি ফিসফিস করে প্রশ্ন করেন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নির্মলাকে। নির্মলা হল ঘোষেদের ছোট মেয়ে।

'হ্যাঁ গো পিসি,' নির্মলার চাপা স্বরে উত্তেজনা ফুটে বেরোচ্ছিল, 'পষ্ট দেখলুম মায়ের জিভটা লাল, টকটকে লাল। অক্ত গড়িয়ে পড়ছে যেন।'

বাকিরা শিউরে উঠলেন সে কথা শুনে, জোড়হাত কপালে ঠেকালেন কেউ কেউ। এর মধ্যেই ক্ষীণ প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে সরকারদের বড় বউ টুম্পা, 'ধুর, কি দেখতে কি দেখেছে, ও বাচ্চা মেয়ে...।'

'অ, আমি বলে বাচ্চা মেয়ে।' ক্ষোভে ফেটে পড়ে নির্মলা, 'আর ঠাউরমশাই দেকলো, ন'পাড়ার দোক্তাদিদা দেকলো, নারানদের বড় জ্যেঠা দেকলো, বাচ্চুকাকু দেকলো, সেগুনো কিচু নয়, না?'

অকাট্য যুক্তির সামনে চুপ করে যায় টুম্পা। কান খাড়া করে এই কথোপকথন শুনছিল শামু আর ক্রমশই তার কৌতূহল চাগাড় দিয়ে উঠছিল। শাশুড়িমা'কে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে আসা ইস্তক একটা ফিসফিস চলছে, খেয়াল করেছে সে। নিতাইয়ের মুখটাও গম্ভীর, বাইরের বৈঠকখানায় শ্বশুরমশাই আর গাঁয়ের গণ্যমান্য লোকেরা বসে মিটিং করছেন। খুব সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটেছে নাকি? প্রবল কৌতূহলে উশখুশ করছিল সে, অথচ নতুন বউয়ের পক্ষে আগ বাড়িয়ে কৌতূহল প্রকাশ করাটাও ভালো দেখায় না।

'মায়ের জিভে রক্ত দেখলে কী হবে গো দিদি?' প্রশ্ন করে সানাপাড়ার রাখাল মণ্ডলের বউ। বয়েস হলে কী হবে, বুদ্ধিশুদ্ধিতে মহিলাকে প্রায় নাবালিকা বললেই চলে।

'সে কী রে বউ, কালীগিরি তান্ত্রিকের ওই গেরামবন্ধনের কতা শুনিসনি তুই?' অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন সামন্তগিন্নি, 'কালীগিরি তান্ত্রিক যে বলে গেসল, খুঁতো ভৈরবীর পুজো করে যাতে গেরামের কোনও অনিষ্ট না হয়, তাই সে নাকি মন্তর দিয়ে গেরাম বেঁদে দিয়ে যাচ্ছে। যে রাতে মায়ের পিতিষ্ঠে হয়, সেই রাতেই শ্মশান থেকে এক ডোম না বাগদী কার একটা মড়া এনে, তাকে তন্তরমন্তর করে, সেই মড়ার হাতের দুটো আর পায়ের দুটো, এই চারটে হাড় গেরামের চার কোনায় পুঁতে বাঁদন দিয়ে দেয়। কিন্তু কালী তান্ত্রিক এও বলে গেসলো যে তার মন্তরের জোর থাকবে মাত্তর তিনশো বচর।'

'তারপর?' নির্মলা গ্রামেরই মেয়ে, এসব কথা তার কমপক্ষে একশোবার শোনা। তবুও ব্যাপারটা আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশ্ন করে সে, 'তারপর কী হবে?'

'তারপর কী হবে জানতে চাইছিস মেয়ে?' থুত্থুরে গলায় বলে ওঠেন এক বৃদ্ধা, এতক্ষণ এক কোনায় একটা মোড়াতে নির্জীব হয়ে বসেছিলেন তিনি।

কান থেকে প্রেশার মাপার যন্ত্র খুলে শামু'র দিকে চাইলেন বর্ষীয়ান ডাক্তারবাবুটি। চিন্তিতস্বরে বললেন, 'প্রেশারটা অ্যাবনর্মালি ফল করে গেছে বুঝলে, কোনও একটা সাডন শক থেকে এরকম হয় মাঝেমাঝে। মাথার কনককশনটাই চিন্তায় ফেলেছে যদিও। হপ্তাদুয়েকের কমপ্লিট বেড রেস্ট লিখে দিয়ে গেলাম, হালকা মুরগির স্টু আর দু-পিস করে সেঁকা পাঁউরুটি খাওয়াবে দুবেলাই। যা যা ওষুধ লিখে দিয়ে গেলাম আজ দুপুর থেকেই খাওয়ানো শুরু করে দিও। দুদিন অন্তর ব্যান্ডেজ পালটে ড্রেসিং করে দিতে হবে। পাঁচদিন বাদে একবার খবর দেবে অবস্থা জানিয়ে।' এই বলে খসখস করে খবরের কাগজের ওপরে রাখা প্যাডে ওষুধ লিখতে থাকেন ডাক্তারবাবু।

'তারপর?' এইবার হাল ধরেন এঁদের মধ্যে যিনি বয়স্কতম, মণ্ডলদের সেই ঠানবুড়ি। যে প্রজার অসাবধানতায় তালদিঘির ভৈরবীর নাম খোঁড়াভৈরবী, তিনি এই মণ্ডলদেরই পূর্বপুরুষ। ফলে পুরো ঘটনার খুঁটিনাটি বংশপরম্পরায় তাঁর জানা, 'ডোম বা বাগদি নয় রে মেয়ে, কালী তান্ত্রিক যার মড়া নিয়ে তুক করেছিল তার নাম ছিল রামাই, সেকালে নাকি নাম করা ডাকাত ছিল সে। তার ভয়ে এই পরগনা থরথর করে কাঁপত।' বলে একটু দম নেন ঠানবুড়ি, তারপর ফের শুরু করেন, 'কালীতান্ত্রিক বলে গেছিল যে, তিনশো বছর পর এই বাঁধনের জোর নাকি আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসতে আসতে শেষ হয়ে যাবে। তখন নাকি ঠিক এক পূর্ণিমা থেকে পরের অমাবস্যার মধ্যে ওই চারটে হাড়ই এক এক করে মাটির উপর উঠে আসবে।' বলে চুপ করে যান ঠানদি।

'কী করে বুজব জোর ফুরিয়ে এসেচে কি না?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে রাখাল মণ্ডলের বউ।

ফিসফিসে হয়ে আসে ঠানদি'র গলা, 'কালীগিরি তান্ত্রিক বলে গেছল, যে রাতে মায়ের জিভে আপনা আপনি রক্ত দেখা যাবে, জানবি যে সেইদিন থেকেই এই চণ্ডালবন্ধনের জোর শেষ। মায়ের জিভে রক্ত আসা মানে, মা বলি চাইছেন। সেই রাতেই মাটির ওপরে উঠে আসবে প্রথম হাড়।'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে নির্মলা। বাকিরাও শ্বাস বন্ধ করে শুনতে থাকে।

'তারপর যে রামাই ডাকাতের হাড় নিয়ে তন্তর করেছিল কালীতান্ত্রিক, সে নাকি সেই রাতেই নরক থেকে জেগে উঠে ফের ফিরে আসবে তালদিঘিতে', বলে থামেন ঠানদিদি।

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে কেউ।

চুপ করে থাকেন ঠানদিদি। তারপর ফিসফিস করে বলেন, 'সে ফিরে আসবে পিশাচ হয়ে। তারপর এক এক করে গাঁয়ের সব্বার রক্ত মাংস চুষে খাবে সেই দানো। এক একটা করে মন্তরের হাড় উঠে আসবে, আর সেই পিশাচের গায়ে দুনো বল আসবে, আরও তেজি হবে শয়তানটা।' হাঁপাতে থাকেন ঠানদিদি। খানিকক্ষণ চুপ থেকে ফের যোগ করেন, 'আর যেদিন শেষ হাড়টা উঠে আসবে সেদিন...' এই বলে চুপ করে যান সেই প্রাজ্ঞ বৃদ্ধা।

'সেদিন কী, ঠানদি?'

'সেদিন এই তালদিঘিতে বাপ পিতেমো'র ভিটেতে পিদিম জ্বালানোর জন্যে একটা লোকও থাকবে না রে মেয়ে,' রহস্যময় শোনায় ঠানদি'র গলা, 'সেই পনেরো দিনের পর নাকি এই গাঁয়ে শুধু কুকুর আর শকুন ছাড়া আর কোনও প্রাণীটির ছায়াও দেখা যাবে না।' এই বলে চুপ করেন ঠানদিদি।

এই আলাপচারিতা শামুর সঙ্গে মন দিয়ে শুনছিলেন আরেকজনও। ডাক্তারবাবু। সব শুনেটুনে তিনি নাকের ভেতর একটা ঘোঁৎ করে শব্দ করে বললেন, 'যত্তসব বুজরুকি আর আজগুবি গালগপ্পো, হুঁ। মেলা রাত হয়েছে, এবার আপনারা যে যার বাড়ি যান দেখি, আর এসব গল্পগাছা বলে রোগীর টেনশন বাড়িয়ে লাভ নেই। আর তুমি শোনো বউমা,' এই বলে শামুর দিকে ফেরেন তিনি, 'যে ক'টা ওষুধ বলে দিয়ে গেলাম টাইমে টাইমে খাইও কিন্তু। অসুবিধা হলে একটা কল দিও নিতাইকে বলে। ফোন নাম্বার তো জানোই।' এই বলে ব্যাগ গুছিয়ে উঠে পড়েন তিনি।

ডাক্তারবাবু বেরিয়ে যাওয়ার ঘণ্টাচারেক পর ডাক্তারবাবুর খোঁজে মুখুজ্জেবাড়িতে লোক আসে, তিনি নাকি বাড়ি ফেরেননি তখনও। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরের দিন ভোরবেলা নাগাদ ডাক্তারবাবুর পাত্তা পাওয়া যায় কালীর মাঠের উত্তর পশ্চিম কোণে।

অবশ্য ডাক্তারবাবু নয়, ডাক্তারবাবুর বডি পাওয়া গেল বললেই ঠিক হয়।

আর তার কোমর থেকে নীচের অংশটা কে যেন খেয়ে গেছে!

'ও হে গোকুল, আছো নাকি?'

'আছি কাকা, সুবল কই?'

'এই তো আমার বাঁ-পাশে। কই হে জগন্নাথ, সাড়াশব্দ নাই কেন?'

'আছি ঠাকুর। কুয়াশায় আশেপাশে কিছু ঠাওর হয় না যে।'

'হাঁকার দিতে থাকো হে, এর ওর নাম ধরে ডাকতে থাকো। ও মনসুর মিঞা, বলি গাড়িই চালাবে না দুটো কথাও বলবে?'

জবাব দেয় না মনসুর মিঞা, একমনে গাড়ি চালাতে থাকে। চারিদিকের যা আবহাওয়া, তাতে এই গোপপে লোকটাও থুম মেরে গেছে মনে হয়।

মাচান গোপীনাথের হাট থেকে ফিরছিল ওরা জনা ছয়েক লোক। বেরিয়ে পড়েছিল অবশ্য বেলা থাকতে থাকতেই। কিন্তু গরাণহাটার মোড়ে মনসুর মিঞার ভ্যানটা বেগড়বাঁই করতে চোখে অন্ধকার দেখে ওরা। আর অন্ধকার দেখার যথেষ্ট কারণও ছিল।

যেদিন সকালে ডাক্তারবাবুর আধখাওয়া শরীরটা পাওয়া যায়, সেই দিনই রাতে একটা অদ্ভুত আওয়াজে দাসপাড়ার মালতীর ঘুমটা ভেঙে গেছিল হঠাৎ করেই। খানিকক্ষণ কান পেতে রাখার পর তার ঠাহর হয় যে আওয়াজটা আসছে সেটা তাদের গোয়ালঘর থেকে। এদিককার গাঁয়েগঞ্জে হামেশাই রাতবিরেতে বুড়ো ভাম বা বনবিড়াল হানা দেয়, অথবা সাপখোপও হতে পারে। মোটমাট গোয়ালঘরে কিছু তো একটা ঢুকেছেই, এই ভেবে ঘরের কোণে রাখা খেটো বাঁশের টুকরোটা এক হাতে আর কেরোসিনের কুপিটা অন্য হাতে ধরে গোয়ালঘরের দিকে রওনা দেয় সে।

পরের দিন শুধু চুটকি পরা পায়ের আঙুল আর কয়েকটা হাড়গোড় পাওয়া গেছিল মালতীর, বাঁশবনের দক্ষিণ কোণে।

সেইদিন থেকেই লোকজনের মনে ভয়টা পাকাপোক্ত ভাবে গেড়ে বসতে থাকে। সত্যি সত্যি রামাই ডাকাত ফিরে এল নাকি পিশাচ হয়ে?

'কথা কও না ক্যান মিঞা', এইবার হাল ধরেন কার্তিক সমাদ্দার। সম্পন্ন ব্যবসায়ী, পাঁচটা সর্ষের তেলের মিল আছে আশেপাশের গঞ্জে, তার মধ্যে একটা আবার মাচান গোপীনাথের হাটে। তাগাদায় বেরিয়েছিলেন সমাদ্দার মশাই। নিজের অ্যাম্বাসাডারটা মাঝরাস্তায় জবাব দেওয়াতে নেহাত বাধ্য হয়েই এই ভ্যানোতে চড়তে হয়েছিল তাঁকে। এতক্ষণ ধরে মনে মনে ইষ্টনাম জপ করছিলেন তিনি। একে রাত বিরেতে বাইরে

থাকা তাঁর সখত না পসন্দ, তার ওপর আজকাল গাঁয়ে যা চলছে তাতে সোয়াস্তিতে থাকার কথাও নয়। চারিদিকের এই এর-ওর নাম ধরে ডাকার মানেও ভালোই বুঝছিলেন সমাদ্দারমশাই, মনের জোর বজায় রাখা আর কি!

'ও মিঞ্রা, কাল বাজারে তোমার পোলাডার লগে কথা হইল গিয়া, বোঝলা? ছ্যামড়ার কথাগুলান ভারি মিষ্ট, সহবত শিখসে খুব। ওরে টোটো চালাইতে কও ক্যান? গঞ্জের বাজারে একখান দুকান দিতে কও না পোলারে, আমি তো আসি এহনও', সাহস যোগানোর চেষ্টা করেন কার্তিক সমাদ্দার, বোধহয় নিজেরই।

জবাব দেয় না মনসুর মিঞা। সেই যে গাড়ি সারিয়ে টারিয়ে তারপর পাশের জঙ্গলে পেচ্ছাপ করতে গেছিল লোকটা, তারপর ফিরে আসার পর থেকেই কেমন যেন থুম মেরে গেছে সে। চোখ দুটো সামান্য লাল, কারও সঙ্গে কথা বলছে না, কাঁধ দুটো সামান্য উঁচু হয়ে আছে। সমাদ্দারের কথার জবাবে সামান্য একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে সে। আর ঠিক সেই সময়েই একটা মাংসপচা গন্ধ যেন মাছধরা জালের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ল সবার ওপরে।

দরজা বন্ধ করে বসে ছিল রাখহরি সাধুখাঁ। এখন পরম ভক্ত বৈষ্ণব হলে কী হবে, এককালে তার নাম করে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানো হতো আশেপাশের গাঁয়ে, এমনই প্রতাপ ছিল তার। একখানা লাঠিগাছ সম্বল করে চার চারটে পাঠানকে ঘায়েল করার গল্প এখনও আশপাশের পাঁচ গাঁয়ের লোকে বলাবলি করে। চিরকালই তার ভয়ডর কম, বুকে দুর্জয় সাহস। যখন বলি দেওয়ার চল ছিল, তখন খোঁড়া ভৈরবীর সামনে এক কোপে জোড়া মোষের গলা নামাত রাখহরি। লোকে এখনও নীচু গলায় বলাবলি করে এককালে যারা রাখহরি'র হাতে বলি হয়েছে তাদের সবাই চারপেয়ে নয়। এহেন ডাকসাইটে রাখহরি নবদ্বীপের রাসের মেলায় ঘুরতে গিয়ে মদনমোহন গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে ফেলে এখন বিলকুল শুধরে গেছে। দু'বেলাই নিরামিষ খায়, একাদশীতে হবিষ্যি করে, পূর্ণিমা অমাবস্যায় তার বরাদ্দ শুধু ফলাহার আর সাবু।

সেই দিন ঠাকুরের নামগান করার জন্যে কত্তালটা নিয়ে বসেছে রাখহরি, ভক্তিগীতি লহরীতে ডুবে গেছে সে, 'গুরু, তোমার চরণ পাব বলে রে' দিয়ে শুরু, শেষতক 'গুরুদেবো দয়া করো দীনজনে' গাইছে, ভক্তিবিনত চোখদুটি থেকে অবিরল নেমে আসছে প্রেমাশ্রুধারা, এমন সময় বাড়ির চালে খড়খড় আওয়াজ হতে একটু অসন্তুষ্টই হয় সে। ছেলে ছোকরার দল চালকুমড়ো চুরি করতে উঠেছে নাকি? সবে দু'খান চালকুমড়ো পেকে উঠেছে, রাখহরির ইচ্ছে যে সামনের বেস্পতবার পূর্ণিমা, সেইদিন বড়ি দিয়ে চালকুমড়োর তরকারি আর অন্যান্য পঞ্চব্যঞ্জনে রাধাকৃষ্ণের ভোগ দেবে সে, শেষ পাতে একটু দই, সঙ্গে মালপোয়া। আহা মহাপ্রভু বড় ভালোবাসতেন। নষ্টচন্দ্রের দল সেসবও করতে দেবে না?

লুঙ্গিটা দু'ভাঁজ করে কোমরে গুঁজে উঠোনে নেমে আসে রাখহরি। হাতে একটা নিভু নিভু টর্চ, ব্যাটারি শেষ হয়ে এসেছে তার। চালের দিকে চেয়ে একটা হাঁকার দেয়, 'কে রে ওখানে?'

জবাব আসার বদলে একটা শব্দ ভেসে আসে তার কানে, চালের ওপার থেকে কী যেন একটা খড়মড় করে ওদিকের চাল বেয়ে নেমে যায়।

হালকা পায়ে একটু দ্রুতই ওদিকে দৌড়ে যায় রাখহরি। ঠাকুরের ভোগের সামগ্রী যায় যাক, কিন্তু রাখহরি সাঁপুইয়ের বাড়ি থেকে কিছু একটা চুরি করে ভেগে যাওয়ার মতো চোর যে এই জেলাতে এখনও আছে সেটা ভেবেই আশ্চর্য হচ্ছিল সে।

বাড়ির পেছন দিকে যেতেই একটা মাংসপচা গন্ধ যেন ভেজানো গামছার মতোই দমবন্ধ করা ভাব নিয়ে তার মুখ-চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এখানে এই গন্ধটা এল কোত্থেকে?

হঠাৎ করেই থমকে গেল রাখহরি, তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিল যে এখানে কিছু একটা আছে যেটা তার বোধবুদ্ধির বাইরে। এক মুহূর্তে সমস্ত স্নায়ু সতর্ক হয়ে উঠল তার, নীচু হয়ে একটু আড়াল হল সে। নিজের

অজান্তেই হাতের তালু ঘেমে যাচ্ছিল তার, তলপেটটা খালি খালি লাগছিল এককালে ডাকাতে কালীর সামনে মানুষ বলি দেওয়া রাখহরি সাধুখাঁর। ঘাড়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে পড়ছিল তার।

বাড়ির পেছন দিকে সামান্য ঝোপজঙ্গল হয়ে আছে। এককালে এসব নিয়মিতভাবে সাফসুতরো রাখত রাখহরি। আজকাল তারকব্রহ্ম নামগানে তার এত সময় যায় যে এসব দিকে মন দেওয়ার সময়ই পায় না সে...

ভাবতে ভাবতেই আমগাছটার গোড়ার দিকে নজর পড়ে তার, ওটা কী ওখানে? একগাদা কালো ছায়া জড়ো হয়ে আছে কেন ওখানে? আর জ্বলজ্বলে ওই আগুনে দুটো কী? কারও চোখ?

খোঁড়া ভৈরবীর মাঠের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনসুর মিঞার ভ্যানোটা যেন হঠাৎ করেই ফের একটা হেঁচকি তুলে থেমে যায়। সবার আগে লাফ দিয়ে নামেন কার্তিক সমাদ্দার, 'হালায় কিয়ের ভ্যান লইয়া বাইরাও তুমি? থাইক্যা থাইক্যা থাইম্যা যায়? মশকরা করো তুমি পেসেঞ্জার লইয়্যা, মশকরা?' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন সমাদ্দারমশাই, কাঁপা কাঁপা হাতে তার মুখটা চেপে ধরে সুবল। একটু অবাক হয়েই পাশে তাকান সমাদ্দার মশাই, জগন্নাথ বাচ্চা ছেলে, সে তখন গোকুলকে জড়িয়ে ধরে ঠকঠক করে কাঁপছে।

আকাশে পঞ্চমীর বাঁকা চাঁদ, তার ম্লান আলোয় বাঁশবনের ছায়া পড়েছে রাস্তার ওপর, সেই আলোয় কার্তিক সমাদ্দার দেখলেন যে মনসুর মিঞা ভেবে যার গাড়িতে এতক্ষণ চড়ে এসেছেন, তার কাঁধ দুটো আরও উঁচু হয়ে উঠেছে, শরীরটা দুনো হয়ে উঠেছে, হাতদুটো বেড়ে গেছে প্রায় দেড়গুণ, মুখের দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে দুটো কুকুরে দাঁত, আর একটা পচা গন্ধে তাঁদের বমি উঠে আসবার জোগাড়!

এইবার আস্তে আস্তে বাঁ-দিকে ঘাড়টা ঘোরালো সেই প্রাণীটা। না, ভুল হল, শুধু ঘাড়টা ঘুরল তার, আর হাত দুটো কাঁধ থেকেই যেন উলটে গেল। টকটকে লাল চোখ দুটো দিয়ে একবার যেন প্রাণভয়ে ভীত কয়েকটা লোককে দেখে নিল সে। তারপর সামনের লোকটাকে বাঁ-হাত দিয়ে খপ করে ধরে মাটির উপরে আধহাত তুলে খানিকক্ষণ দেখল, তারপর যেভাবে বাচ্চারা খেলনা পুতুলের মাথাটা খুলে ফেলে, ঠিক সেভাবেই ডানহাতটা দিয়ে তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আনল একটানে।

বাকিরা আর দাঁড়াবার সাহস পায়নি, পিছনবাগে ফিরে দৌড় দেয়। শুধু দৌড়তে গিয়ে পড়ে যান সমাদ্দারমশাই।

সাহস করে আরও কিছুটা এগোয় রাখহরি। পচা বিশ্রী একটা গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উঠে আসছিল তার, কাঁধের গামছাটা নাকে চেপে ধরে সে। আরও একটু এগোতেই নরম নরম কী যেন একটা তার পায়ে ঠেকতে থেমে গিয়ে সেদিকে টর্চ মারে রাখহরি।

একটা মানুষের হাত, কনুইয়ের নীচ থেকে কাটা। না, ভুল হল।

কাটা নয়, ছেঁড়া! তার গায়ে এখনও রক্ত লেগে!

খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে সেদিকে চেয়ে থাকে রাখহরি, বুকটা ধ্বক করে ওঠে তার। মানুষের কাটা হাত-পা দেখার অভ্যেস বহুদিন নেই রাখহরির, তার ওপর জ্যান্ত মানুষের হাত যে ওভাবে মুচড়ে ছিঁড়ে আনা যায় সে কথা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

দরদর করে ঘামতে থাকে রাখহরি, বুকটা ধড়াস ধড়াস করছিল তার। কাঁপতে কাঁপতে সামনের দিকে টর্চ ফেলে সে, আর স্ট্যাচু হয়ে যায়।

কী ওটা, কোন প্রাণি? থরথর করে কাঁপতে থাকা আলোয় রাখহরি দেখে প্রকাণ্ড একটা উলঙ্গ শরীর কীসের ওপর যেন ঝুঁকে পড়েছে, সারা শরীর বড় বড় কালো লোমে ঢাকা, কান বলে কিছু নেই আর বড়

বড় বাঁকানো নখওয়ালা দুটো মোটা মোটা হাত দিয়ে কী একটা যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। মাংসের গন্ধ ছাড়াও এবার আরও একটা উগ্র গন্ধ নাকে এল রাখহরি'র।

কাঁচা রক্তের গন্ধ।

এইবার সেই প্রাণীটা লাল টকটকে চোখ তুলে তাকাল ওপরের দিকে। আর সেই অমানুষিক বিভীষিকার দিকে তাকিয়ে ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল রাখহরির, পেছন ফিরে পড়ি কি মরি করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল সে।

পালাবার আগে শুধু আর একটা জিনিসই চোখে পড়েছিল তার।

প্রাণীটা যেটার ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল সেটা যে একটা শরীর তা চিনতে ভুল হয়নি রাখহরির। তারই কাটা মাথাটা আয়েশ করে খাচ্ছিল সে। আর ওই আতঙ্কের মধ্যেও শরীরটা কার সেটা দেখামাত্র চিনতে দেরি করেনি রাখহরি।

ওটা কার্তিক সমাদ্দারের শরীর।

মণ্ডলবাড়ির লোকজন অবশ্য এত কথা জানত না। পরদিন রাতভোরে মণ্ডলের ছোট মেয়ে তাপসী ঘুম থেকে উঠে তাদের বাড়ির পাশের ছোট পুকুরটায় মুখ ধুতে গিয়ে দেখে সারা পুকুরের জল টকটকে লাল, আর তাতে কাঁচা রক্তের গন্ধ।

কেউ যেটা দেখেনি, কখনও দেখবেও না, সেটা হচ্ছে যে পুকুরের নীচে পাঁক থেকে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে এসেছিল একটা প্রায় গলে পচে যাওয়া হাতের হাড়!

বৈঠক বসেছিল মুখুজ্জেবাড়ির বাইরের ঘরে। গাঁয়ের পাঁচজন গণ্যমান্যরা উপস্থিত ছিলেন, ছিলেন যোগেন ভটচায্যি মশাই। ছিল আরও দুজন যারা সামনাসামনি দেখেছে সেই পিশাচকে, তারা।

রাখহরি আর দনু!

সারা গ্রাম জুড়ে একটা থমথমে সন্ত্রস্ত পরিবেশ। ভোরের আলো ফোটার আগে কেউ ঘরের বাইরে বেরোয় না, আর সন্ধে নামতে না নামতে ঘরের দরজায় খিল! তারপর চিল্লিয়ে গলা ফেড়ে রক্ত তুলে ফেললেও কাউকে পাওয়া যাবে না। গত দশদিনে আটজন শিকার করেছে তালদিঘির পিশাচ! তার সঙ্গে গেছে বছিরুদ্দি আর নাসিরের দুটো দুটো করে চারটে ছাগল, তারিণী কর্মকারের একটা বাছুর আর পাড়ার বোসেদের গোয়াল থেকে দুটো দুধেল গাই। আজকাল সন্ধের পর মানুষ তো দূর, কুকুরও দেখা যায় না তালদিঘির পথে। আশেপাশের গাঁ তো বটেই, এই গাঁয়ের বাসিন্দা যারা তাদের আত্মীয়স্বজনরাও আজকাল সভয়ে এড়িয়ে চলছে তালদিঘিকে।

পুলিশে অবশ্য প্রথামাফিক খবর দেওয়া হয়েছিলো, তারা চৌকিও বসিয়েছিল একখান। মস্ত একখান ভুঁড়ি দুলিয়ে আর মোটা গোঁফজোড়া মুচড়ে হাবিলদার রতনলাল চৌবে এসে বসেছিলো চৌকিতে। 'কওনো বদমাশ উদমাস কর রহা হোগা ইয়ে সব। আনে দো সালেকো হামরে সামনে,' ভজুয়ার দোকানের হিং দেওয়া গরমাগরম একধামা কচুরি বেশ আয়েশ করে চিবোতে চিবোতে সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা জনা দশেক লোককে বলেছিল রতনলাল। তারপর একঘটি ঘন সর পড়া দুধ গলায় ঢেলে তৃপ্তির উদগার তুলে বাকি কথাটা একটু ভারী গলায় শেষ করেছিল সে, 'একবার হামরে হাথ লগ যায়ে তো দেখনা। উলটা টাংগকে মারেঙ্গে সালেকো।'

পরদিন ভোরে চৌবেজি'র বেল্টটা আর একপাটি জুতোই শুধু পাওয়া গেছিল বাজারের মধ্যে, তখনও রক্ত লেগে ছিল দুটোতেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বডির কোনও হদিস পাওয়া যায়নি।

'পুলিশ কী বলছে?' চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করেন রায়বাবু। এককালে উঁচু পোস্টে সরকারি চাকরি করতেন পরিমল রায়, তাঁর মতামতের একটা দাম আছে।

'লোকাল থানা হাত তুলে দিয়েছে,' হতাশ স্বরে বলেন মুখুজ্জেমশাই, 'বড়বাবু বললেন ভূতপ্রেতের কারবার ওনার আন্ডারে পড়ে না। উনি রিপোর্ট লিখে সদরে ফাইল পাঠিয়ে দিয়েছেন। এরপর যা করবার ওপরওয়ালারা করবেন।'

'তাহলে উপায়?' শুকনো মুখে প্রশ্ন করেন সাঁপুইদের বড়কত্তা অধীররঞ্জন সাঁপুই, লোকে বলে গেঁড়ে সাঁপুই, 'তদ্দিনে তো গাঁ ফাঁকা হয়ে যাবে দাদা। আট আটজন লোক...'

'আট নয় কাকা, নয়জন,' চিন্তিত মুখে বলে রাখহরি, 'গতকালই গরাণহাটার জঙ্গলে পচাগলা শরীর পাওয়া গেছে মনসুর মিঞা'র। মাথার আধখানা আর একখানা পা পাওয়া গেছে মাত্র...গাড়ি সারাই করে যখন জঙ্গলে গেছিল পেচ্ছাপ করতে, তখনই বোধহয়...'

ওদিকে নিতাই খুঁজছিল শামুকে। বউকে চোখে চোখে রাখে নিতাই, নতুন বিয়ের ক্ষেত্রে সেটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কারণটা অন্য, তার মনে একটা সন্দেহ পাকিয়ে উঠছে কয়েকদিন ধরেই।

মা যেদিন মন্দিরে পড়ে গেলেন, তবে থেকেই কেমন যেন অদ্ভুত ব্যবহার করছে মেয়েটা। কথা নেই কারও সঙ্গে, চুপচাপ থাকে দিনের বেশিরভাগ সময়ে, কথা বলতে গেলে এমন চোখে তাকায় যে দেখে বুকের রক্ত ঠান্ডা হয়ে যায়।

তার থেকেও সাঙ্ঘাতিক ঘটনাটা ঘটে কয়েকদিন আগে।

প্রথম প্রথম এতসব খেয়াল করেনি নিতাই। তার ঘুম খুব গাঢ়, একবার বালিশ ছুঁলে তার আর সাড় থাকে না। তবে সেইদিন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছিল নিতাইয়ের, উঠে অভ্যেসবশে পাশে হাত বাড়িয়ে যে দেখে পাশে বউ নেই! প্রথমে ভেবেছিল হয়তো বাথরুমে গেছে শামু, এসে পড়বে এখুনি। বেশ কিছুক্ষণ পরেও শামু আসছে না দেখে উঠে যায় নিতাই, গিয়ে দেখে বারান্দায় গ্রিলের গায়ে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে অদ্ভুত সুরে মন্ত্রের মতো কীসব যেন চাপা গলায় নাকি কান্নার মতো আউড়ে যাচ্ছে তার নতুন বিয়ে করা বউ।

সেইদিন হঠাৎ অকারণেই শীত করে উঠেছিল নিতাইয়ের। চুপচাপ বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছিল সে। তারও ঘণ্টাখানেক পরে ভোররাতে দিকে ফিরে আসে শামু।

কী করছিল সে অত রাতে? কোথায় গেছিল তার বউ?

'শামু, ও শামু, গ্যালে কই?' চাপাস্বরে ডাকতে ডাকতে বাড়ির অন্দরমহলে বউকে খুঁজছিল নিতাই। একটা কুটিল সন্দেহ তার মনে কয়েকদিন ধরে ক্রমেই ঘোট পাকিয়ে উঠছে। শুধু সেইদিন নয়, তারপর থেকেই রোজ রাতে ঘুমোবার পর বেশ কিছুক্ষণের জন্যে শামু যায় কোথায়? আর সেইসব রাতেই একটার পর একটা অঘটন ঘটে যায় কী করে?

'শামু, শামুউউ, কই গ্যালে গো? লোকজন এসেছে, চা'টা করে দাও দিকি। বলি নিমকি-টিমকি আছে কিছু?' বলতে বলতে রান্নাঘরের পেছনে এসে উপস্থিত হয় নিতাই। আর তারপর সামনের দৃশ্যটা দেখে শিরদাঁড়ায় একটা বরফের স্রোত নেমে যায় তার।

সেখানে তখন শামু পিঠ ফিরিয়ে বসে একটা অদ্ভুত কাজ করছিল। তার সামনে কঁক কঁক করে ছটফট করছে বাজার থেকে কিনে আনা দু-চারটে মুরগি, স্পষ্টতই ভয় পেয়েছে তারা। আর আছে একটা সদ্য কাটা পাঁঠা। এ-বাড়িতে মুরগি বা পাঁঠা বাজার থেকে কেটে আনা হয় না, জ্যান্ত আনা হয়। তারপর এই বাড়িতেই কেটেকুটে রান্না করা হয় তাদের। পাঁঠা কাটার জায়গাটা একটু দূরে।

খানিকক্ষণ আগে বিশু কামার এসে পাঁঠাটা কেটে দিয়ে গেছে, মাটিতে শোয়ানো আছে কাটা পাঁঠাটা। আর নিতাইয়ের বউ, সদ্য বিয়ে করা বউ সেই পাঁঠার রক্ত দু-হাতে তুলে নিজের সারা মুখে মাখছে আর

রামদাটার ওপর আঙুলে করে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে! সঙ্গে সেই দুর্বোধ্য ভাষায় সুরেলা মন্ত্র আউড়ানো!

ধীরে ধীরে সরে আসে নিতাই, বুকটা ধড়াস ধড়াস করছিল তার। হা ঈশ্বর, এ কী দেখল সে? সে যা ভাবছিল তাহলে কী সেটাই সত্যি?

'কিন্তু এর প্রতিকার কী মুখুজ্জেমশাই?' আর্তনাদ করেন বগলাচরণ শিকদার, 'কাজ কারবার সব লাটে উঠতে চলল যে। ছেলেমেয়ে পরিবার নিয়ে তো গাঁয়ে বাস করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেখছি। আপনিই বলুন, এভাবে বাঁচা যায় নাকি?'

রাখহরি একটা কথা ভাবছিল, ভ্রু'টা কুঁচকে ছিল তার, 'আচ্ছা মণ্ডলদের ঠানদিদিকে একবার জিগ্যেস করলে হয় না? মানে কালীগিরি তান্ত্রিক এসব থেকে বাঁচবার কোনও কিছু মন্তর বা উপায় টুপায় কিছু বলে গেসলো কি না ঠানদিদির ওই সেই পূর্বপুরুষকে?'

কথাটা মনে ধরে সবার, এই কথাটা কারও মনে আসেনি কেন এতক্ষণ! তার ওপর ঠানদিদি এখন এ বাড়িতেই, বাসন্তীপিসির পরিচর্যার তদারক করছেন। মুখুজ্জেমশাই কাজের লোক কানাইকে ডেকে বলেন অন্দরমহলে খবর দিতে।

আধ হাত ঘোমটা টেনে একটু কুঁজো হয়ে এলেন ঠানদিদি। এঁদের সক্কলের থেকে বয়সে বড় হলে কী হবে, প্রাচীন যুগের লোক তিনি, ঘোমটা টোমটা বিলক্ষণ মানেন। দনু উঠে গিয়ে ঠানদিদির হাত ধরে যত্ন করে একটা মোড়ায় বসিয়ে দেয়, 'বেঁচে থাকো বাবা,' থুত্থুরে গলায় নাতির বয়সি নবীন মাস্টারমশাইটিকে আশীর্বাদ করেন ঠানদিদি। তারপর সমবেত ভদ্রজনের প্রশ্নটা শুনে অনেকক্ষণ ভুরু কুঁচকে টুচকে ভেবে বলেন, 'কই না তো! এরম কিছু তো বাবা আমাকে বলে যায় নি রে ভাই।'

'কিছুই বলে জাননি কালী তান্ত্রিক? ও ঠানদিদি, একটু চেষ্টা করো না, যদি কিছু মনে টনে থেকে থাকে তোমার', অনুনয় করেন এক-দুজন।

ভুরু কুঁচকে কী সব যেন ভাবতে থাকেন ঠানদিদি। সেইদিকে সাগ্রহে চেয়ে থাকে সক্কলে। বেশ কিছুক্ষণ পর বিড়বিড় করে বলতে থাকেন তিনি, 'একবার...একবার অবশ্য...বুঝলি ভাই...আমি তখন খুব ছোট...রাত্তিরে খেয়ে দেয়ে ঘুমের ভান করে শুয়ে আছি...মা এঁটো বাসনকোসন ধুয়ে এসে বাবার সঙ্গে গল্প করছে...এমন সময় কথায় কথায় এই খোঁড়া ভৈরবীর কথা ওঠে, বুঝলি? আমি...আমার তখন ঘুম আসি আসি করছে...মা ঠিক এটাই জিগ্যেস করল...চোখটা জুড়িয়ে আসার আগে...ঠিক শুনিনি...মনে হল বাবা বলছে...কী যেন বলল?' বলে উদ্রান্ত চোখ দুটো তুলে সবার দিকে চাইলেন...'কী বলেছিল বলত বাছা! মনে পড়ে না কেন?'

এতক্ষণ সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল ঠানদিদির কথা। কারও কিছু বলতে সাহস হচ্ছিল না। শুধু রাখহরি ফিসফিস করে বলল, 'আরেকটু মনে করার চেষ্টা করো না ঠানদিদি। কী বলেছিল তোমার বাবা?'

চোখ বন্ধ করে মনে করার চেষ্টা করেন ঠানদিদি, কপালটা কুঁচকে যায় বুড়ো মানুষটার, 'বাবা বলছিল...বাবা বলছিল যে...যে...আমাদের যে পূর্বপুরুষের জন্যে মায়ের মূর্তির আঙুল ভেঙেছিল...তিনি নাকি খুব ভয় পেয়েছিলেন...তখন তাঁকে নাকি কালী তান্ত্রিক সাহস দিয়ে বলে...কালীগিরি বলে গেছিল যে...কী যেন...হ্যাঁ ...মনে পড়েছে...কালী তান্ত্রিক বলে গেছিল যে...'

'কী বলে গেছিল কালী তান্ত্রিক?' ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করে দনু।

'বলে গেছিল যে...মায়ের যদি ইচ্ছে হয় তাহলে নিজের পুজোর ব্যবস্থা মা নিজেই করবেন।'

শুনেই লাফিয়ে ওঠেন অধীর সাঁপুই, 'ধুর, এটা একটা সমাধান হল?' হতাশা ঝরে পড়ে তাঁর স্বরে, 'এ তো একটা কথার কথা, এরকম তো আমরা হামেশাই বলে থাকি। বলি উনি কি কোনও কাটান বা মন্তর বলে গেছিল তোমার ওই পূর্বপুরুষকে? যেটা কিনা তাঁর ছেলে, ছেলের ছেলে এই করে করে তোমাদের কারও কাছে জানা আছে?'

অসহায়ের মতো মাথা নাড়েন ঠানদিদি, 'না রে ভাই, এমন কিছু তো বাবা আমাকে বলে গেছে বলে মনে পড়ে না!'

'আপনার আর কোনও ভাই বা বোন নেই ঠানদিদি?' প্রশ্ন করেন মুখুজ্জেমশাই।

'না রে ভাই, আমার তো আর কোনও জ্ঞাতিগুষ্ঠি কেউ নেই।'

'তাহলে আর কী মুখুজ্জেমশাই, এই গাঁ থেকে বাস ওঠাতে হবে মনে

হচ্ছে,' হতাশ শোনায় রায়বাবুর গলা, 'গিন্নি কথাটা অনেকদিন ধরেই বলছিলেন বটে। কালই তবে আমরা পাটনা চলে যাচ্ছি মেয়ের কাছে। মা যদি চান তবেই ফিরব, নচেৎ নয়। চললাম মুখুজ্জেমশাই, চললাম ভাইসব, সাবধানে থাকবেন, ভৈরবী মা সবার মঙ্গল করুন।' বলে চাদরটি কাঁধে দুলিয়ে বাইরের দিকে হাঁটা দেন রায়মশাই।

সেই শেষ দেখা রায়বাবুর। পরের দিন ভোরবেলা পাশের গ্রাম জগতবল্লভপুরের একজন মুনিষ এসে খবর দেয় যে দুই গাঁয়ের মধ্যিখানে যে শুকনো খালটা আছে তার মধ্যে রায়বাবু পড়ে আছেন। রায়বাবু বলতে তাঁর শরীরটার কথাই বলেছিল সে। কোমরের নীচ থেকে অর্ধেক খাওয়া, মাথাটা উলটো করে ঘোরানো। তবে তার থেকেও যেটা ভয়ানক সেটা হচ্ছে যে বাকি শরীরটা কে যেন ধারালো রামদা জাতীয় কিছু একটা দিয়ে প্রবল আক্রোশে কুপিয়ে খণ্ড খণ্ড করে রেখে গেছে।

আর খালের মাটি ভেদ করে, রায়বাবুর খুলি ফাটিয়ে মুখ ফুঁড়ে উঠেছিল একটা পুরোনো, শ্যাওলা ধরা হাড়ের টুকরো!

নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছিল নিতাই। মানে ঘুমের ভান করে একপাশ ফিরে শুয়েছিল বিছানায়। আজ অমাবস্যা, যেদিন তার মা ভৈরবী মন্দিরে পড়ে গেছিল তারপর ঠিক পনেরো দিন হল আজ। তার ওপর আজ সূর্যগ্রহণও বটে। কালী তান্ত্রিকের কথা সত্যি হলে আজই একটা এসপার বা ওসপার হয়ে যাওয়ার কথা।

আজ খোঁড়াভৈরবীর মন্দিরে ধুমধাম করে অমাবস্যার পুজো হওয়ার কথা ছিল, প্রতি অমাবস্যাতে তাই হয়। কিন্তু এইবার আর কেউই সন্ধের পর বাড়ির বাইরে থাকার ঝুঁকি নেয়নি, সবার কাছেই ভক্তির থেকে ভয়ের দাম বেশি। ফলে গত তিনশো বছরের মধ্যে এই প্রথম অমাবস্যার পুজোয় নিষ্প্রদীপ থাকবে খোঁড়া ভৈরবীর মন্দির।

মাঝরাত শেষ হয়েছে কি হয়নি, বাইরে একটা শনশন হাওয়া উঠল। তারই মধ্যে নিতাইয়ের মনে হল কে যেন দূর থেকে মেয়েলি গলায় একবার 'আয় আয় আয়' করে ডেকে গেল, সেই ভূতুড়ে ডাকে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। চোখ বুজে শুয়ে আছে নিতাই, ঠিক এমন সময় বাইরের হলঘরের বড় ঘড়িটায় ঢং করে একটা শব্দ হল।

রাত একটা।

এইবার বিছানায় একটা মৃদু নড়াচড়া টের পায় নিতাই। চোখ বুজে থাকলেও শরীরের বাকি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে ওঠে তার, পেশিগুলো টানটান হয়ে যায়।

শামু উঠছে বিছানা ছেড়ে।

নাক ডাকার শব্দটা বাড়িয়ে দেয় নিতাই। বুঝতে পারে যে উঁচু খাট থেকে হালকা পায়ে ঘরের মেঝেতে লাফিয়ে নামল শামু। ঝুন করে একটা আওয়াজ হল নুপূরের।

মিনিট তিনেক অপেক্ষা করে উঠে পড়ে নিতাই। বিছানা থেকে নেমে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে সে। সারা বাড়ি চুপচাপ, কোথাও কোনও শব্দ নেই। শুধু দূর থেকে অস্পষ্টভাবে নুপূরের শব্দ আসছে তার কানে। কোনদিকে গেল শামু? বারান্দার দিকটা একবার দেখে নেয় নিতাই, নাহ একদম ফাঁকা।

খিড়কি দরজার দিকে আসতেই ঝুন ঝুন ঝুন শব্দটা ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যায়। মানে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো শামু। ওদিকে যেতেই সিঁড়ির নীচ থেকে ছায়ার মতো বেরিয়ে আসে দুইজন। তাদের একজনকে ফিসফিস করে প্রশ্ন করে নিতাই, 'কাকা, তোমার বউমাকে দেখলে নাকি?'

সেইভাবেই চাপাস্বরে উত্তর দেয় রাখহরি, 'এই তো এখান থেকে খিড়কি দরজার দিকে গেল। নুপূরের আওয়াজ তো শুনলামই...আর...', কী একটা বলতে গিয়ে থেমে যায় সে।

'আর কী কাকা?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে নিতাই।

'বউদির চোখ দুটো না কেমন যেন জ্বলছিল, বুঝলে নিতাইদা...কয়লায় আগুন লাগলে যেমন লাগে...' উত্তর দেয় দ্বিতীয়জন, দনু।

শিকারে বেরিয়েছে শামু? বুকটা ধ্বক করে ওঠে নিতাইয়ের। একটা চাপা কষ্টও যেন বুকে গুমরে উঠতে থাকে তার, তার বউই তাহলে সেই পিশাচ? এদ্দিন ধরে একটা পিশাচীকে নিয়ে ঘর করেছে সে?

তারপর চোয়াল শক্ত করে সে, আজ এর শেষ দেখে ছাড়বে নিতাই মুখুজ্জে।

'অস্তর কিছু নিয়েছো?' প্রশ্ন করে নিতাই।

রাখহরি নিয়েছে একটা আধহাতি তলোয়ার, আর দনু নিয়েছে একটা পাকা বাঁশের লাঠি। সব দেখেশুনে নিতাই বলে, 'চলো যাওয়া যাক।'

খিড়কি দরজাটা ভেজানোই ছিল, অর্থাৎ শামু এখান থেকে এখনই বেরিয়েছে। ধীরে সন্তর্পণে ওরা তিনজন বাইরে আসে। এবার ওরা যাবে কোনদিকে? নুপূরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না কেন?

বাঁদিকে এগোলে একটা ছোট মতন ফাঁকা জমি, আর ডানদিকে একটু এগোলে একটা বটগাছ। তার পেছনে মণ্ডলদের পুকুর, যে পুকুরের জলই সেদিন রক্তে ভেসে গেছিল। প্রথমে ওরা ডানদিকে যাওয়াই মনস্থ করে।

বটগাছের কাছে এসে ওরা হদিস পায় না যে কোনদিকে যাবে, দুদিকে দুটো রাস্তা গেছে। এমন সময় হাতের ছোট টর্চটা মাটির দিকে নামিয়ে একবার জ্বালিয়েই বন্ধ করে দেয় নিতাই, সেই সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে জ্বলে ওঠা আলোয় ওরা দুটো জিনিস দেখতে পায়।

এক, দুপাটি নুপূর কে যেন খুলে রেখে গেছে তেমাথার মোড়ে, তাতে সিঁদূর লাগানো।

আর দুই, মাটিতে জলপায়ের ছাপ। জলের ফোঁটায় আর পায়ের ছাপে মিলেমিশে একটু অস্পষ্ট হয়ে গেলেও বোঝা যায় যে এই পুকুরে পা ডুবিয়ে কেউ হেঁটে গেছে দক্ষিণমুখো।

ওইদিকেই খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ, তিনজনে চুপচাপ হাঁটা দেয় সেদিকে।

রাখহরির মনে হচ্ছিল টর্চের চকিত আলোয় আরও কী যেন একটা দেখল ও, কিন্তু সেটা যে ঠিক কী সেটা মাথায় বসছিল না তার। কী যেন দেখল ও? কী যেন একটা অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না? এই দমবন্ধ করা ভূতুড়ে পরিবেশে অস্বস্তি হতে থাকে রাখহরির।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা টের পাচ্ছিল যে সেই পচা মাংসরক্ত মেশানো গন্ধটা ধীরে ধীরে বাতাসে পাক খেয়ে খেয়ে মিশছে। চারিদিকে অমাবস্যার মিশমিশে কালো অন্ধকার, তারার আলোও দেখা যায় না আকাশে। তার মধ্যেই কাঁচা পথ ছেড়ে পাকা রাস্তায় ওঠে ওরা। রাখহরি আর নিতাই গ্রামের মানুষ, আঁধারে তাদের চোখ জ্বলে। অসুবিধা হচ্ছিল দনুর, শহরের লোক সে, রাতের অন্ধকারে রাস্তাঘাটে চলা অভ্যেস নেই। পদে পদে হোঁচট খাচ্ছিলো সে।

মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর বাঁ-পাশে বাঁশবাগান এল, সেটা পেরোলেই মাঠ। আর সেখানে আসতেই একটা অবয়ব নজরে পড়ল ওদের!

এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে যে একটা ছায়ামূর্তি রাস্তার শেষ দিকে ওদের আগে আগে হাঁটছে, রাস্তা পেরিয়ে মাঠে নামবে এবার। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও সেই কালো ছায়াটির অবয়ব চিনতে ভুল হয় না ওদের।

ওটা শামু।

কিন্তু শামুর হাতে লম্বা মতো ওটা কী ঝুলছে?

তিনজনেই চট করে একটু রাস্তার বাঁ-পাশে বাঁশবাগান ঘেঁষে সরে আসে। ধীরে ধীরে পিছু নিতে হবে শামুর। দেখতে হবে যে, ও কোথায় যাচ্ছে। বিন্দুমাত্র শব্দ হলেই সর্বনাশ।

ঠিক এইসময় পিশাচের গায়ের পচা গন্ধটা যেন এই অন্ধকারের মধ্যেই হঠাৎ দপ করে বেড়ে উঠল। প্রবল বেগে বমি উঠে আসতে লাগল ওদের। যদিও শামুর দিক থেকে নজর সরাচ্ছিল না ওরা। শামুও যেন মাঠে নামার আগে একবার থমকে দাঁড়াল। তারপর শিয়াল যেমন নাক উঁচিয়ে বাতাসে গন্ধ শোঁকে ঠিক সেইভাবে মাথা উঁচু করে কী যেন শুঁকতে লাগল সে।

নিজের বুকের ধক ধক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল নিতাই। কী করছে শামু? তাদের গায়ের গন্ধ শুঁকছে? এইবার শামু পিশাচীর শিকার কী ওরা? নিতাইয়ের পিঠটা খামচে ধরেছিল দনু বা রাখহরির মধ্যে কেউ একজন, সে হাতটা থরথর করে কাঁপছিল। শ্বাস বন্ধ করে মাথা নীচু করে বসে ছিল ওরা, ঠিক সেইসময়ে একটা অঘটন ঘটে গেল। পাশে সরতে গিয়ে একটা ছোট গর্তে পা পড়তে 'আহ' করে উঠল রাখহরি।

সেই শব্দ শুনে ধীরে, অতি ধীরে পিছনে ঘুরল শামু। আর তারপর টকটকে চোখদুটি মেলে সোজা তাকালো তাদের দিকে।

এরপর সেই ঘোর অন্ধকারের আকাশ আর আর মাঠ পিছনে রেখে, ধীরেসুস্থে হাতের লম্বা জিনিসটার মাথা মাটিতে ঘষটাতে ঘষটাতে আস্তে আস্তে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল সেই অবয়ব, একটু আগেও যাকে নিতাই চিনতো শামু বলে। নিতাইয়ের চোখের তারা নড়ছিল না বিন্দুমাত্র, সেই অন্ধকার রাতে তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল এক আশ্চর্য ভয়াল ছবি। শামুর পিছনে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে এক শব্দহীন নীলকালো রঙের আকাশ, আকাশের শেষে একপ্রান্তে নিঃসাড়ে ফুটে আছে একটি অসহায় আলোহীন মন্দিরের ছায়া, আর মন্দিরের পায়ের কাছে বিছিয়ে আছে একটি ধূ-ধূ করা মাঠ, খোঁড়াভৈরবীর মাঠ!

সেই মাঠের সামনে সরু পথ ধরে এগিয়ে আসছে একটি নারীমূর্তি, যার হাতে ধরা জিনিসটার মাথা রাস্তার মাটিতে পাথরে ঠেকে ভীতিপ্রদ আওয়াজ তুলছে,

ঠংং ঠংং ঠংং...

ভয়ে যেন পাথর হয়ে গেল নিতাই, তার কাঁধ খামচে ধরা হাতের ব্যাপারে তার মনেই রইল না আর। অজগরের চোখের দিকে যেমন তাকিয়ে থাকে ছাগলছানা, ঠিক তেমনই সামনের দিকে চেয়েছিল সে।

ধীরে ধীরে সেই ছায়ামূর্তিটা আরও কাছে আসে তার। এতক্ষণে তার হাতে ধরা জিনিসটির আন্দাজ পায় নিতাই! যে রাম'দাটা দিয়ে তাদের বাড়িতে জ্যান্ত পাঁঠা কাটে বিশু কামার, সেইটাই শামুর হাতে!

আজ আর তাহলে খালিহাতে নয়, অস্ত্রহাতে শিকারে বেরিয়েছে তালদিঘির পিশাচ!

পা'টা আটকে গেছিল নিতাইয়ের, চারপাশের আর যেন কিছু তার নজরে ছিল না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সামনের দিকে চেয়ে আছে সে, ঠিক সেই একটাই ঘটনা ঘটল।

নিতাইয়ের চোখের সামনে হঠাৎ করে একটা কুয়াশার মিহি পর্দা যেন নেমে এল রাস্তার মধ্যিখানে। অবশ্য বেশিক্ষণের জন্য নয়, কয়েক সেকেন্ডের বেশি হবে না। পরক্ষণেই সরে গেল পর্দা, আর দেখা গেল যে ওর সামনে আর কিচ্ছু নেই, সব ফাঁকা!

শামু উধাও!

ব্যাপারটা এত চকিতে ঘটে গেল যে ধাঁধা লেগে গেল নিতাইয়ের। মনে হল হঠাৎ করেই যেন উবে গেল সামনের লোকটা।

আস্তে আস্তে বাঁশবনের মধ্যে আরও খানিকটা সেঁধিয়ে গেল নিতাই। আর ঠিক তখনই খেয়াল হল যে তার পাশে দনু বা রাখহরি, দুজনের কেউ নেই।

চাপাস্বরে এক বার দুজনের নাম ধরে ডাকল নিতাই। অন্ধকার হাওয়া যেন বাঁশপাতার মধ্যে বয়ে গিয়ে খিলখিল হাসির শব্দ তুলতে লাগল নিতাইয়ের চারপাশে। নিতাইয়ের মনে হল যেন সেই অন্ধকার বাঁশবন তাকে গিলে খেতে আসছে। এই প্রথম ভয় পেল নিতাই, তীব্র ভয়!

বাঁ-দিকে একটু সরলো নিতাই, তার পায়ের নীচে মড়মড় করে উঠল শুকনো পাতার দল। অন্ধকারের মধ্যেই ঠাহর করে বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে অন্যদিকে যেতে চাইছিলো সে। ধীরে, খুব ধীরে পা ফেলতে লাগল সে।

আর ঠিক সেই সময়েই ব্যাপারটা কানে এল তার।

ঠিক যখনই সে পা ফেলছে পাতার ওপর, ঠিক তখনই আরেকজনও পা রাখছে শুকনো পাতার স্তূপের ওপর। যেন নিতাইয়ের পাতা মাড়িয়ে যাওয়ার শব্দে লুকোতে চাইছে নিজের পায়ের শব্দ। সেই নির্জন অন্ধকারের মধ্যে কে যেন অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে অনুসরণ করছে তাকে!

প্রবল ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল নিতাই। শীতের রাতেও দরদর করে ঘামতে লাগল সে। তবুও তার মধ্যেই এক-পা দু-পা করে এগোচ্ছিল নিতাই। মাঝে মাঝে তাকে অনুসরণ করার শব্দটা দূরে সরে যাচ্ছিল, মাঝে মাঝে একেবারে কাছে চলে আসছি, কিন্তু নিতাইয়ের সবসময়েই মনে হচ্ছিলো যে একজোড়া লাল টকটকে চোখ যেন অনুসরণ করছে তাকে। বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছিল নিতাইয়ের, নিজের শ্বাসের শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছিল সে।

হাতড়াতে হাতড়াতে সামনে একটা বড় ঝোপ পায় নিতাই, ছোটবেলায় লুকোচুরি খেলতে খেলতে এখানে বহুবার লুকিয়েছে সে। তার আড়ালে বসে একটু জিরোতে যাবে নিতাই, ঠিক সেই সময় আকাশ বাতাস শিউরে দিয়ে কে যেন ডেকে উঠল খোনা গলায়, 'আয় রে আয়, আয় রে আয়...'

সেই ডাক শুনে বুকটা খালি হয়ে গেল নিতাইয়ের। কোনও দিকে না তাকিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে দুদ্দাড় করে দৌড়তে লাগল সে। তার গায়ে সপাং সপাং করে বেত মারতে লাগল কচি বাঁশের ডগাগুলো। সেসব গ্রাহ্য করল না নিতাই, পাগলের মতো দৌড়তে লাগল। এক একটা মুহূর্ত অনন্তকাল বলে মনে হচ্ছিল তার।

মনে নেই কতক্ষণ পাগলের মতো দৌড়েছে সে, এমন সময় হঠাৎ করেই যেন বাঁশবনটা শেষ হয়ে গেল তার সামনে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

সামনে খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ।

আর সেই মাঠের পাশে, বাঁশবনের ধার ঘেঁষে ওটা কী?

বা, ওটা কে?

একদলা আঁধার যেন কীসের ওপর ঝুঁকে বসেছিল তার দিকে পেছন ফিরে। নিতাইয়ের পায়ের শব্দ শুনে সেই ঘোর কালো অন্ধকার ফিরে তাকালো তার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার টকটকে লাল চোখদুটো দেখে ধ্বক করে বুকটা যেন মুহূর্তের জন্যে গলায় আটকে গেল নিতাইয়ের।

লাল টকটকে জিভ বার করে একবার যেন ঠোঁট চেটে নিল সেই জমাট কালো অন্ধকার, তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল সে...সেই অপার্থিব হাসি শুনে শরীরের প্রতিটি রক্তের ফোঁটা জমে গেল নিতাইয়ের। হাতে পায়ে আর বল পেল না সে, হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। আর ঠিক তখনই তার চোখে পড়ল কার ওপর এতক্ষণ ঝুঁকে পড়ে ছিল সেই অন্ধকারের পুঞ্জ।

রাখহরির শরীর।

আস্তে আস্তে চোখ ওপরে তোলে নিতাই, দেখে যে আগুনের ভাঁটার মতো চোখে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সেই দলা দলা কালো ছায়া। তারপর নিতাইয়ের পিছনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠে ডানহাতে কী একটা যেন তুলে ধরে সে!

তাদের বাড়ির রামদা'টা!

আর সহ্য হয় না নিতাইয়ের, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় সে।

আর ঠিক সেই সময়েই চোখ খুলে তাকায় রাখহরি। জ্ঞান ফিরে পেয়ে কয়েক মুহূর্ত ভোম মেরে ছিল বটে, কিন্তু তারপরেই হুঁশে ফিরে আসে সে। আর দেখে যে অপার্থিব ছায়ার ডেলা তাকে টেনে এনেছিল এই বাঁশবনের কিনারে, সেই-ই একটা বড় রাম'দা তুলেছে সামনে অজ্ঞান হয়ে থাকা নিতাইয়ের দিকে।

আর থাকতে পারল না রাখহরি। এককালে মুখুজ্জে পরিবারের অনেক নুন খেয়েছে তার পরিবার। আজ প্রাণ থাকতে তাদেরই এক সন্তানকে বেঘোরে মরতে দেবে রাখহরি? তার রক্তে ঘুমিয়ে থাকা ভয়ডরহীন আধা ডাকাতটি যেন হঠাৎই ঘুম থেকে জেগে উঠে রক্তচক্ষু মেলে চাইল চারিদিকে। পিঠের দিকে গুঁজে রাখা আধহাতি তলোয়ারটা হাতড়ে হাতড়ে বার করে সেই অন্ধকারের রাক্ষস, থুড়ি রাক্ষসিটার পায়ে বসিয়ে দিল রাখহরি সাধুখাঁ।

প্রথমে তলোয়ারটা অনেকটাই গুঁজে দিতে পেরেছিল বটে রাখহরি। কিন্তু তারপরই তাকে এক লাথিতে দশ হাত দূরে ফেলে দেয় সেই পিশাচিটা, তাতে তার অমানুষিক জোরটা টের পায় রাখহরি। তার গুরুদেব তাকে শিখিয়েছিলেন যে মারামারির সময় কখনও মাথা গরম করতে নেই। এতদিন বাদে বোধহয় গুরুর শিক্ষাটা কাজে দিল তার। উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়তেই কিছুটা গড়িয়ে যায় রাখহরি, তারপর দ্রুত উঠে একটা ঝোপের আড়ালে চলে যায় সে।

সেখানে বসে দম নিচ্ছে সে, ঠিক তখনই একটা মোটা মোটা নখওয়ালা থাবা দিয়ে কে যেন তার গলাটা চেপে ধরে পেছন থেকে!

আতঙ্কের থেকেও বেশি হতবাক হয়ে গেছিল রাখহরি, এ আবার কার হাত? তবে কিনা চোদ্দো বছর ধরে জামালউদ্দিন ওস্তাদের কাছে মিছেই দেহবন্ধন আর নানান শারীরিক কসরৎ শেখেনি সে এককালে। এক ঝটকায় সেই অমানুষিক থাবা থেকে নিজেকে মুক্ত করে পাশের ঝোপে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে রাখহরি।

যে থাবাদুটো রাখহরির গলা টিপে ধরেছিল, সে হাতদুটো থমকে যায় একটু, তারপর এক-পা এক-পা করে ইতিউতি হাওয়ায় গন্ধ শুঁকতে থাকে সে হাতদুটোর মালিক, যেন বোঝার চেষ্টা করে যে রাখহরি ঠিক কোথায় আছে।

ধীরে ধীরে নীচু হয়ে একটা ঢিল কুড়িয়ে নেয় রাখহরি, তারপর সেটা ছুঁড়ে দেয় দূরের একটা ঝোপের দিকে। উদ্দেশ্য ছিল যে পিশাচটার দৃষ্টি ওদিকে ঘুরিয়ে দিলে সে যদি এক দৌড়ে নিতাইয়ের শরীরটা টেনে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। মানে যতক্ষণ এই অসম লড়াইতে সে বেঁচে থাকতে পারে ততক্ষণই তার জিত। ভোর হতে আরও ঘণ্টা দু-আড়াই। এই সময়টা পার করতে পারলেই...

প্রথম দিকে রাখহরির মতলবটা খেটেও গেছিল বটে, ঢিলটা অনেক দূরেই তাক করে ফেলেছিল রাখহরি, পিশাচটা দৌড়েও গেছিল সে দিকে। মুশকিলটা হল যখন নিতাইয়ের শরীরটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই অস্বাভাবিক দ্রুততায় ঝড়ের মতো সেই বাঁশবন তছনছ করে তার সামনে এসে দাঁড়াল সেই দানব!

ধীরে ধীরে নিতাইয়ের অচৈতন্য নিথর শরীরটা মাটিতে শুইয়ে ফেলে পিছনের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল রাখহরি। মাথা আর বোধবুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছিল তার। দরদর করে ঘামছিল সে, তার মাথার ভেতরটা শূন্য হয়ে গেছিল এতক্ষণে। জীবনে এত বীভৎস আর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়নি তার।

তাকে কে টেনে আনল সেই বাঁশবনের দিকে? আর আনলোই যদি তো মারল না কেন? আর পরে তার গলাটা আঁকড়ে ধরলই বা কে? তার সামনে এখন কে? আর তখনই বা কে ছিল?

নরক থেকে উঠে আসা সাক্ষাৎ কালপিশাচটা তখন এক-পা এক-পা করে তার দিকে এগিয়ে আসছিল, তার মুখের থেকে রক্তের ফেনা উড়ে যাচ্ছিল আশেপাশের বাতাসে। সেই অমানুষিক ভয়াল বীভৎসতার সামনে এতক্ষণ ধরে জমিয়ে রাখা যাবতীয় সাহস একেবারেই উড়ে গেল রাখহরির। তবু তার মধ্যেই তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নরকের জীবটিকে চিনে নিতে অসুবিধা হল না তার! নিজেরই দু'চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না! তাহলে সে যা ভেবেছিল, সত্যিই তাই?

অসহায় আতঙ্কে পালাতে গিয়েও পালাতে পারে না রাখহরি, উলটে পড়ে যায় মাঠের ওপর। স্থিরভাবে সে দেখে যে ধীরে ধীরে এসে তার ওপর দুদিকে দুই পা মেলে দাঁড়ায় সেই পিশাচ। উগ্র রক্তমাংসের গন্ধে আর ভয়ে বমি উঠে আসে রাখহরির।

ঈশ্বরের নাম জপছিল রাখহরি, তার মধ্যেই পিশাচটা তার বড় হাতদুটো নামিয়ে আনল রাখহরির কণ্ঠার ওপর। নারকীয় দুটো বড় বড় বাঁকানো নখ সবে নেমে এসেছে গলা বরাবর, চোখের সামনে তার ভয়াবহ মৃত্যু নেমে আসতে দেখে প্রায় অজ্ঞান রাখহরি, এমন সময় মনে হল পিছন থেকে কে যেন মাথাটা টেনে ধরল সেই পিশাচের।

আর তার পরেই শুধু একটা জিনিসই দেখতে পেল রাখহরি, একটু ওপর থেকে একটা বড় রামদা নেমে এল দনুর গলায়। ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে গেল দনু পিশাচের।

আর নিতে পারল না রাখহরির স্নায়ু। শুধু অজ্ঞান হতে হতে দু'চোখ বুজে আসার আগে সে দেখল যে তার একপাশে তখনও পড়ে আছে ধড়ফড় করতে থাকা দনুর লাশ, আর বাঁ-হাতে সেই কাটা মাথাটা ধরে, ডানহাতে রক্ত চুঁইয়ে পড়া রামদা'টা টানতে টানতে মন্দিরের দিকে হেঁটে যাচ্ছে মুখুজ্জেবাড়ির নতুন বউ!

কিন্তু অজ্ঞান হতে হতেও একটা জিনিস দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় রাখহরি!

প্রথম থেকেই যে খটকাটা তার মাথায় ঘোরাফেরা করছিল, এক মুহূর্তে যেন সেটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। প্রথমে সেই পুকুরের পাড়ে নিতাইয়ের টর্চের একঝলকের আলোয় জলপায়ের ছাপ দেখা ইস্তক এটাই তার মাথায় আটকে ছিল, কিন্তু তখন সেটা বোঝেনি সে। বুঝল এখন।

তার চোখের সামনে একের পর এক পা ফেলে খোঁড়াভৈরবীর মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছে শামু, ওরফে শাম্ভবী। আর সেই পায়ের ছাপের মধ্যে ডানপায়ের বুড়ো আঙুলের ছাপের কোনও চিহ্ন নেই! তার জায়গায় শুধু রক্তের দাগ।

চোখ বুজল রাখহরি, ঠানদিদির কথা মনে পড়ে গেল তার। কালীগিরি তান্ত্রিক বলে গেছিলেন যে মায়ের যদি ইচ্ছে হয় তাহলে নিজের পুজোর ব্যবস্থা মা নিজেই করবেন। সেই কথাই খেটে গেল আজ, তালদিঘির খোঁড়াভৈরবী আজ নিজের পুজোর নৈবেদ্য নিজেই জোগাড় করে নিয়েছেন!

শামুর ডান পায়ের আঙুল কী প্রথম থেকেই ছিল না, নাকি তারই তলোয়ারের ঘায়ে আজ খোয়া গেল সেটা? সেটা মাথায় ঢোকার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডাকাত রামাই সাধুখাঁ'র উত্তরাধিকারী, রাখহরি সাধুখাঁ!

